গণতন্ত্রে খুনের অধিকার এবং ....

তথাগত রায়

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

গণতন্ত্রে খুনের অধিকার

তথাগত রায়

ইদানীং জনযুদ্ধ গোষ্ঠী ও কামতাপুরী সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের ফলে খুনের রাজনীতি বা রাজনৈতিক খুন ব্যাপারটা আবার সংবাদপত্রের প্রথম পাতার ওপর দিকে উঠে এসেছে। যে-অঞ্চলে খুন হয়েছে সেখানকার মানুষ সন্ত্রস্ত, মুখ্যমন্ত্রী ব্যতিব্যস্ত, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর দলের একজন পলিটবুরো সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর সুরক্ষা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপও করে ফেলেছেন। এর আগে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যে রাজনৈতিক খুন প্রচুর হয়েছে, কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে সংবাদপত্রের হেডিং হওয়ার মতো ঘটনা শেষ ঘটেছিল সত্তরের দশকে, যাকে নকশাল আমল বলা হয় সেই সময়ে। কিন্তু শুরুটা এখানেও নয়, তার জন্য যেতে হবে, আরো পেছনে, চল্লিশের দশকে। রাজনৈতিক খুন নামক এই অভিশাপের ধারাবাহিকতা কীভাবে চলে এসেছে, এর উৎসই বা কোথায়, সমাধান কিছু আছে কিনা এসবের একটু অনুসন্ধান করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রনৈতিক ও আইনি পরিকাঠামোর খানিকটা আলোচনা না করলে খুনের রাজনীতির হদিশ পাওয়া যাবে না —তাই এই বিষয় দিয়েই নিবন্ধ শুরু করতে হবে।

(যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়, "গণতন্ত্রে খুন করা কি আইনসম্মত?" ঝটিতি উত্তর সম্ভবত পাওয়া যাবে "আপনার মাথা কি খারাপ?" কিন্তু প্রশ্নটা, বা তার জবাব, মোটেই এত সরল নয়। বরঞ্চ প্রশ্নের উত্তরে প্রতিপ্রশ্ন হওয়া উচিত, "কী রকম গণতন্ত্র কী রকম খুন এবং কী রকম আইন?")

খুন মানে যদি যে কোনও রকমের নরহত্যা ধরা যায়, তা হলে ভারতীয় দন্ডবিধি অনুযায়ী তা শুধু ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারসূত্রে (ধারা ৯৬, যার নাম রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স, মোটামুটিভাবে আত্মরক্ষার্থে নরহত্যা) আইনসম্মত। অন্য যে-কোনও রকম নরহত্যার জন্য কড়া শাস্তির ব্যবস্থা আছে, যা মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত গড়াতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশে আইন একরকম নয়, তালিবান আমলে আফগানিস্তান বা সৌদি আরবে অন্য বহুরকম আইনসম্মত খুন টিভিতে পর্দায় দেখা গেছে। এর সম্পূর্ণ চেহারাটা দেখতে হলে গণতন্ত্র নামে পৃথিবীতে যা যা চলে, এবং

আইনব্যবস্থার কত রকমফের আছে সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে হবে। 'গণতন্ত্র' বিষয়টি জনগণেশের সঙ্গে সংস্পৃক্ত, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গণতন্ত্র নামধারী নানারকম বিচিত্র ও অনেক ক্ষেত্রে, কিম্ভুত জিনিস আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর মধ্যে প্রাচীনতম, এবং যা আমাদের সংবিধানসম্মত, তার নাম লিবারেল বা মাল্টি-পার্টি ডিমোক্রেসি অর্থাৎ উদার বা বহুদলীয় গণতন্ত্র যা আজ প্রথম বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে চলে, উন্নয়নশীল যে-কটি দেশে চলে তার মধ্যে অন্যতম ভারত। এই গণতন্ত্রের জন্ম ইংল্যান্ডে, পরবর্তীকালে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত আকারে গৃহীত হয়, তারপর বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রধান লক্ষণ একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি ও জনসাধারণের হাতে নির্বাচনের মাধ্যমে, সেই বিভিন্ন দলের যে-কোনও একটি বা একাধিককে মস্‌নদে বসানোর বা সেখান থেকে সরাবার ক্ষমতা। আবার মনে হতে পারে, খুন প্রসঙ্গে এসব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কচকচানির দরকার কী, কিন্তু দরকার আছে, আইনব্যবস্থার আলোচনার সময়েই সেটা পরিষ্কার হবে।

এ ধরনের গণতন্ত্র বহু রাষ্ট্রনায়কের আদৌ পছন্দ নয়, কিন্তু 'গণতন্ত্র' নামটা খুব পছন্দ। তাই পঞ্চাশের দশকে ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণ প্রবর্তন করেছিলেন 'গাইডেড ডিমোক্রেসি', চিনে মাও 'পিপলস্ ডিমোক্রেসি'। পাকিস্থানে আইয়ুব খাঁন 'বেসিক ডিমোক্রেসি'। এগুলো সবই নানারকম মোড়কে একনায়কতন্ত্র বা এক-পার্টি তন্ত্র। মার্কসবাদ লেনিনবাদের 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র'ও আসলে কম্যুনিস্ট পার্টির একনায়কতন্ত্র। অপর পক্ষে আমাদের মত বহু দলীয় গণতন্ত্র মার্কসবাদীদের চোখে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র', আমাদের সংসদ তাদের নেতা লেনিনের চোখে ছিল 'শুয়োরের খোঁয়াড়', যদিও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই শূকরীয় গণতন্ত্রের সুযোগ পুরোমাত্রায় নিয়ে থাকেন। ধর্মীয় রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র বিশেষ করে ইস্‌লামি দেশগুলি অবশ্য খুব বেশি গণতন্ত্রের ধার ধারে না, পাকিস্থানের একদা-প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বলেছিলেন, ইস্‌লামে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্রের কোনও স্থানই নেই। তবে সেখানেও শব্দটি সম্বন্ধে মোহ আছে, যেমন একনায়ক গাদ্দাফি-শাসিত লিবিয়ার সরকারি নামের মধ্যে 'জামাহিরিয়া' শব্দটি আছে, আরবি ভাষায় যার অর্থ 'গণতন্ত্র'। এই প্রবন্ধে গণতন্ত্র বলতে ভারতে চালু উদার বা বহুদলীয় গণতন্ত্রকেই বোঝানো হবে। এর বিপরীত সব রকমের শাসনতন্ত্রের নাম স্বৈরতন্ত্র বা টোটেলিটেরিয়ান রেজিম্।

এইসব বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা ও বিভিন্ন ধরনের গণতন্ত্রকে আশ্রয় করে বিভিন্ন ধরনের আইনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর তাবৎ আইনব্যবস্থাকে চারটি প্রধান ভাগে বা গোত্রে ভাগ করা হয় এদের নাম, প্রথম, ইংলিশ কমন ল; দ্বিতীয়, রোমানো-জার্মানিক ল; তৃতীয় সোশালিস্ট ল; এবং চতুর্থ, রিলিজিয়াস ল। এর

মধ্যে গণতন্ত্রী দেশগুলিতে (সোশাল ডেমক্র্যাট-শাসিত দেশগুলি সমেত) প্রথম দু ধরনের আইন চালু। ইংরাজিভাষী বা একদা-ইংরাজশাসিত দেশগুলিতে ইংলিশ কমন ল চলে, তার মধ্যে ভারত অন্যতম। প্রসঙ্গত, এবং বিস্ময়করভাবে, ইংরাজের নিজের দেশ ব্রিটেনের অঙ্গরাজ্য স্কটল্যান্ডের আইনব্যবস্থা কিন্তু ইংলিশ কমন ল' থেকে অনেকটাই আলাদা। ইউরোপের মূল ভূখন্ডও একদা- এতদঞ্চলের শাসিত দেশে রোমানো জার্মানিক ল চলে। যেহেতু ইংলিশ কমন ল ও রোমানো জার্ণানিক ল দুটিই মূলত গণতান্ত্রিক আইনব্যবস্থা এবং দুটিরই উৎপত্তি নিকটবর্তী দুই ভূখন্ডে, সেইজন্য এই দুটি আইনব্যবস্থার মধ্যে আদানপ্রদান হয়েছে প্রচুর যার প্রমাণ ইংরাজের আইনে লাতিন কথার প্রাচুর্য। সোশালিস্ট ল বা সমাজতান্ত্রিক আইন বস্তুত বিপ্লবপন্থী ও পার্টি আশ্রিত আইন, সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্বাণপ্রাপ্তির পর এই আইনব্যবস্থা প্রধানত চিন ও সংলগ্ন কিছু দেশে চলে। রিলিজিয়াস ল বা ধর্মীয় আইন প্রধানত ইস্‌লামি দেশ ও ভ্যাটিকানে চলে, তবে এর কিছু কিছু উপাদান প্রচুর গণতন্ত্রী দেশের আইনব্যবস্থার মধ্যেও ঢুকে গেছে, যেমন ভারতের হিন্দু ও মুসলিম আইন, ক্যাথলিক দেশগুলির জন্মনিয়ন্ত্রণ-বিরোধী আইন ইত্যাদি। কিছু দেশ, যেমন পাকিস্থানে, দু'ধরনের আইনের সহাবস্থানের ফলে এক বিচিত্র খিচুড়ি আইনব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে যাকে কোনও গোত্রের মধ্যে ফেলাই দুঃসাধ্য। কিন্তু পাকিস্তানে নামে গণতন্ত্র এবং খুনের অধিকারের প্রশ্নে সেদেশের আইনের বিশেষ করে হুদুদ অর্ডিন্যান্স নামক আইনের আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যা পরে সবিস্তারে করা হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এবং জুরিসপ্রুডেন্স বা আইনতত্ত্বের এই কচকচির কারণ নিশ্চয়ই এখন পরিষ্কার হয়েছে। বস্তুত, 'গণতন্ত্র-সদৃশ বহুব্যবহৃত ও অপব্যবহৃত শব্দের দ্যোতনা পরিষ্কার করে নেওয়া এ ধরনের প্রবন্ধে অত্যন্ত প্রয়োজন, তা না হলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন, এই আলোচনার মধ্যে প্রচুর ইংরাজি শব্দ ব্যবহার বাধ্য হয়ে করতে হবে, কারণ আমাদের আইন ইংরাজি ভাষায় লেখা। অনেক সময়েই অনেক শব্দের যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না, পেলেও তার অর্থ নিয়ে গন্ডগোল হতে পারে, সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ নাও হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতের আইনব্যবস্থা ইংলিশ কমন ল গোত্রের। এই আইনব্যবস্থার উৎপত্তি ইংল্যান্ডের একাদশ শতাব্দীর রাজা জন্-কে দিয়ে (জোর করে) সই করানো 'ম্যাগনা কার্টা' নামক বিখ্যাত দলিল থেকে। এখান থেকে এর ক্রমবিকাশ হতে আরম্ভ হয়, প্রধানত বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, যে কারণে একে বলা হত জাজ্‌মেড্‌ল। পরবর্তীকালে এরসঙ্গে সংসদ-প্রণীত বা স্ট্যাট্যুট আইন যুক্ত হয়। ভারতের আইন-প্রণয়ন শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ গভর্ণর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের হাতে, সংবিধান বলবৎ হবার পর তা বর্তায় সংসদের ওপর। ইংলিশ

কমন ল-এর প্রয়োগ ভারতে হয়েছিল ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে। কালক্রমে সংসদীয় আইন ভারতে বলবৎ হতে থাকায় আজ ইংলিশ কমন ল-এর জাজমেডল-এর অংশ প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই, আছে শুধু মূল ধাঁচা বা কাঠামোটি; এবং এই ধাঁচা বা কাঠামোটি এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কী আছে এই কাঠামোতে? এই কাঠামোতে আছে কয়েকটি মূলনীতি, যার ওপর আমাদের আইনব্যবস্থার অপরাধ-বিচার অংশটা দাঁড়িয়ে আছে। এই নীতির যে-কটি এই প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজন সেগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে দেওয়া হল:

১। সবার উপর আইন, আইনের উপরে কেউ নয়, আইনের চোখে সবাই সমান। একে বলা হয় রুল অফ ল, বা আইনের শাসন, এবং ইকুয়ালিটি বিফোর ল।

২। একজন মানুষ যতক্ষণ না দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে ততক্ষণ সে নির্দোষ। একে বলা হয় প্রিসাম্পসন অফ ইনোসেন্স।

৩। একজন মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে তার দোষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হবে। এর নাম প্রফ বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট।

৪। একজন মানুষ তার নিজের বিচার কখনই করতে পারে না।

৫। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকেই শাস্তি দেওয়া যাবে না! এই দুটিকে বলা হয় প্রিন্সিপলস অফ ন্যাচরাল জাস্টিস্, বা সাধারণ বুদ্ধিতে বিচারের মূলসূত্র।

৬। বিচারবিভাগের ওপর প্রশাসন বিভাগের সামান্যতম কর্তৃত্বও থাকবে না। একে বলা হয় সেপারেশন অফ পাওয়ার্স।

৭। একই অপরাধের জন্য কাউকেই দুবার বিচার করা ও সাজা দেওয়া যাবে না। এর নাম রুল এগেনস্ট ডাবল জেপার্ডি।

এবার আমরা নিবন্ধের বিষয়বস্তুর আলোচনার কাছে এসে গেছি। এই নিবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করা হবে যে, গণতন্ত্রে খুন করে পার পাওয়ার জন্য খুনিরা যেসব সুযোগ নেয়, সেই সব রক্ষাকবচ যা আসামি বা অভিযুক্তদের রক্ষার জন্য শুধু গণতন্ত্রেই আছে, স্বৈরতন্ত্র বা টোটেলিরিয়ান রেজিম-এ নেই। এবার গণতন্ত্রে খুনের অধিকার আছে কি নেই জানতে হলে নিবন্ধের প্রথমে বর্ণিত তিনটি প্রতিপ্রশ্ন ছাড়াও আরও একটি প্রশ্ন করতে হবে: কী রকম অধিকার?

অধিকার দু রকমের হয়। প্রথমটির নাম ডি জুরে বা আইনগত অধিকার, দ্বিতীয়টির নাম ডি ফ্যাক্টো বা কার্যত অধিকার। একটি সম্ভাব্য সাধারণ ঘটনার উদাহরণ দিলে দুটোর মধ্যে তফাতটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরুন, আপনার বাড়ির সামনে দু'কাঠা জমি আছে, আপনি এমনি ফেলে রেখেছেন, সামনে একটু জমি

থাকলে আপনার ছোটবেলার ময়মনসিংহের বাড়ির কথা মনে পড়ে, যে-বাড়ি থেকে আপনারা হিন্দু হবার অপরাধে বিতাড়িত হয়েছিলেন। পাড়ার কিছু ছেলে সেই জমিটা আপনার কাছে চেয়েছিল —এমনিই, দাম দিয়ে কিনতে নয়, জমিটা তো দাদু আপনার কোনও কাজে লাগছে না, আমাদের কেলাবের জন্য দিয়ে দিন না! আপনি সম্মত হননি, আপনার জমি আপনি যতদিন খুশি ফেলে রাখবেন সে অধিকার আপনার আছে। এটার নাম ডি জুরে বা আইনত অধিকার। এবার পুজোয় আপনি বেড়াতে গেলেন, দেড় মাস বাদে ফিরে এসে দেখলেন সেই দুকাঠা জমিতে চাটাই ও টিন দিয়ে বানানো এক চালাঘর উঠে গেছে, ভেতরে মহা উৎসাহে ক্যারাম খেলা চলছে। তর্জনগর্জন দুরের কথা, থানা পুলিশ, পুরসভা আদালত বহু কিছু করেও কিছু হল না, বেশ কিছু টাকা আক্কেলসেলামি দিয়ে, বছর দেড়েক বাদে আপনার বোধোদয় হল, যে ওই দু কাঠা জমি আপনি জন্মের মতো হারিয়েছেন। কিন্তু আপনার অধিকারের কী হল? এর উত্তর, আপনার ডি জুরে বা আইনত অধিকার ঠিকই আছে, কিন্তু ডি ফ্যাক্টো, বা কার্যত অধিকার আপনি হারিয়েছেন। সে অধিকার পেয়েছে কে ? পেয়েছে ক্লাব।

আপনার ডি জুরে বা আইনগত অধিকার এসেছে রাষ্ট্রের তৈরি আইন থেকে, রাষ্ট্রেরই কর্তব্য সেই অধিকার নিশ্চিত করা, এবং এই নিশ্চিত করার পথে যে বাধা সৃষ্টি করবে (অর্থাৎ আইন যে ভাঙবে) তাকে শাস্তি দেওয়া। এই কাজে যদি রাষ্ট্র অবহেলা করে, বা (যে কোনও কারণেই হোক) ইচ্ছে করে না করে তবে এই দু ধরনের অধিকারের মধ্যে ফাঁক তৈরি হয়। উত্তরোত্তর আইন ভাঙার মধ্যে দিয়ে এই ফাঁক ক্রমাগত বাড়তে থাকে; কারণ কিছু **(মানুষ রাষ্ট্রের ক্লীবতার সুযোগ নিয়ে লঘু থেকে গুরুতর আইন ভাঙতে শুরু করে। যখন এই ফাঁক ধীরে ধীরে বিশাল চওড়া হয়ে পড়ে তখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ-খুন করার ডি ফ্যাক্টো, বা কার্যত অধিকার জন্মায় বা জন্মাতে পারে।)**

কীভাবে এই ফাঁক তৈরি হয়, আর কীভাবেই বা তা বাড়তে থাকে সেটা এবার কিছু উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। আমাদের এই ভারতে কিছু সরল আইনভাঙার প্রথা আছে যা নিয়ে সরকার বা রাষ্ট্র বিশেষ মাথা ঘামায় না। এর মধ্যে অগ্রগণ্য বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ, মালিকের অনুমতি না নিয়ে দেয়ালে লেখা বা পোস্টার মারা, রাস্তার মধ্যে দোকান খোলা, মলমূত্র ত্যাগ, লালবাতির নিষেধ সত্ত্বেও গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়া, 'নো পার্কিং' বা 'নো এনট্রি' না মানা, ট্রেনে ঢিল মারা, পটকা ফাটানো, অনুমতি না নিয়ে মাইক বাজানো, চোর পেটানো ইত্যাদি। যখন দেখা যায় যে রাষ্ট্র, সরকার বা পুলিশ এসবে গা করছে না তখন আইন

সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের তাচ্ছিল্য বাড়ে, এবং আইনভঙ্গকারীদের আরও এক ধাপ উঠবার সাহস আসে। এর পরের ধাপে আছে পথ বা ট্রেন অবরোধ, ট্রেনের ন্যায়সঙ্গত যাত্রীদের তুলে দিয়ে বসে পড়া, জোর করে চাঁদা বা 'তোলা আদায়, পছন্দমতো লোককে চাকরি বা ঠিকা না দিলে অত্যাচার, মেয়েদের অশ্লীল ইঙ্গিত করা, অন্যের জমি বা খাস জমি জবরদখল করা! এর পরের ধাপেই আছে খুন, সঙ্গে আনুষঙ্গিক, অর্থাৎ লুটমার, নারীধর্ষণ ইত্যাদি।

যে-খুনের অধিকার নিয়ে আলোচনা, সে-খুন কিন্তু যে-কোনও ধরনের খুন হলে চলবে না। এরকম খুনে প্রথমত, খুনিদের তরফে প্রচুর লোক থাকতে হবে, তাতে যেমনই খুনকে 'জনরোষ' বলে চালানো যাবে, তেমনই এত লোক থাকায় ঠিক কে খুন করেছে তা খুঁজেও পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, যাকে বা যাদের খুন করা হচ্ছে তার বা তাদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর কোনও অভিযোগ থাকতে হবে, না থাকলে খাড়া করতে হবে, সাধারণত একফোঁটা সত্যের সঙ্গে এক বালতি মিথ্যা মিশিয়ে। এই অভিযোগের মধ্যে আবার কোনও রকম জনস্বার্থ (কল্পিত হলেও চলবে) জড়িত থাকলে খুব ভাল হয়। এই অভিযোগ সম্মিলিত জনতার কাছে নেশার দ্রব্যের কাজ করবে, তাদের সম্মিলিত বিবেককে খুব ভালভাবে চেপে দেবে, তাদেরকে এমন বীভৎসতায় প্ররোচিত করবে যা তারা ঠান্ডা মাথায় ভাবতেই পারে না। এই ধরনের খুনকে আধুনিক বাংলায় খুব নরম করে বলা হয় 'আইন নিজের হাতে নেওয়া' --এর অনুচ্চারিত অর্থ খুনের যে একেবারে কোনও কারণ নেই তা নয়, তবে নিজেরা এত সব কিছু না করে একে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই ভাল হত। আর এর সঙ্গে যদি খুনিদের কোনও রকম অন্ধবিশ্বাস (ধর্ম, জাত, রাজনীতি, পার্টি, গায়ের রঙ, যা থেকেই উদ্ভুত হোক না কেন) যুক্ত হয় তবে তো সোনায় সোহাগা! বস্তুত দেখা গেছে, এই তিনের সংখ্যাধিক্য, কল্পিত অভিযোগ ও অন্ধবিশ্বাস--এই ত্র্যহস্পর্শ থেকেই গণখুনের উৎপত্তি, পরে উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। তবে এর সঙ্গে আর একটা জিনিসও যোগ করতে হবে, যার থেকে গণখুনিরা প্রচুর সাহস পায়। একে বলা যায় রাষ্ট্রযন্ত্রের, বিশেষত পুলিশের ক্লীবতা এবং অনেক ক্ষেত্রে গণখুনে প্ররোচনা ও উৎসাহ দেওয়া।

এই ধরনের গণখুন দেশ বিদেশে কত রকমের হয় তা এবার দেখা যেতে পারে।

প্রথমত আছে 'বিশুদ্ধ' রাজনৈতিক কারণে গণখুন, যেমন আমাদের পরিচিত নকশালী খুন, যার বিস্তারিত আলোচনা এই নিবন্ধে পরে করা হয়েছে। একে 'বিশুদ্ধ' বলা হয়েছে, কারণ এর মধ্যে কোনও জাতিগত, সম্প্রদায়গত বা ধর্মগত ব্যাপার জড়িত নেই, শুধু কারও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে, রাজনৈতিক স্বার্থকে নীতির মোড়কে জড়িয়ে এই হত্যা। এর সবচেয়ে বড়

উদাহরণ হচ্ছে কাম্বোডিয়ায় মাওবাদী কম্যুনিস্ট একনায়ক পল পতের হাতে দশ লক্ষ স্বজাতীয় মানুষের হত্যা। খমের রুজ বাহিনীর নেতা পল পত ১৯৭৫ সালে ক্ষমতা দখল করে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই ক'বছরে পল পত ও তাঁর পিশাচবাহিনী খমের রুজ্ নিজের দেশের আনুমানিক দশ লক্ষ মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে। স্তালিনের রাশিয়ার 'কুলাক্' দের (সম্পন্ন চাষী) গণখুন, মাওয়ের 'সংস্কৃতিক বিপ্লবের' সময়কার শ্রেণীশত্রু খুনের আদলেই এই খুন, কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়ে পল পত তার দুই গুরুকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গিয়েছিলেন। কাম্বোডিয়ায় যাঁরা খুন হয়েছিলেন তাঁদের মূলত দোষ ছিল 'বুদ্ধিজীবী' হওয়া-- এঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, অধ্যাপক, করণিক, সাংবাদিক, ডাক্তার, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি মানুষ। পল পতের স্বপ্ন ছিল দেশকে পেছনে ঠেলে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেখানে প্রান্তিক চাষি ও তাদের থেকে লোক নিয়ে তৈরি সেনাবাহিনী ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

পূর্ব ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ধরনের গণখুন হত, ইংরাজিতে এর নাম পগ্রম্ বা লিনচিং। পগ্রম্ শব্দটি রুশ ভাষার, এখন ইংরাজির অর্ন্তগত, রাশিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি জায়গায় ইহুদিদের গণধোলাই (এর মধ্যে গণধর্ষণ ও গণখুনও প্রচুর পরিমাণে থাকত) দেওয়াকে এই নামে অভিহিত করা হত। এই প্রক্রিয়ায় খ্রিস্টানরা বিশাল দল নিয়ে ইহুদিদের 'ঘেটো' (শহরের মধ্যে পাঁচিলঘেরা যে-জায়গায় ইহুদিদের থাকতে বাধ্য করা হত) আক্রমণ করত এবং নির্বিচারে ইহুদিদের পেটাত, খুন করত ও তাদের সম্পত্তি নষ্ট করত। লিনচিং-এর উৎপত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময়। ভার্জিনিয়ার চার্লস লিঞ্চ নামের এক স্বাধীনতাকামী এই প্রক্রিয়ায় দলবল নিয়ে বেশ কিছু ইংরাজ রাজত্বের সমর্থককে হত্যা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই প্রক্রিয়াটি বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গের হাতে কৃষ্ণাঙ্গের অত্যাচারের এক মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়--সাধারণত কোনও শ্বেতাঙ্গ মহিলার সঙ্গে কোনওরকম দুর্ব্যবহারের অপবাদ দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গটিকে মারা হত। ধরা যাক, অনেক সময় কৃষ্ণাঙ্গ টি কোনও শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে সমানে সমানে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে--যাকে সেই সময়কার মার্কিন-দক্ষিণী ভাষায় বলা হত 'আপিটি নিগার'--এই অপবাদও লিঞ্চ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ ছাড়া ইহুদি, ক্যাথলিক ও ইউরোপ থেকে নবাগত, শেতাঙ্গ কিন্তু ইংরাজি না-জানা অধিবাসীদের, এবং কৃষ্ণাঙ্গদের হয়ে লড়া শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধেও লিনচিং প্রয়োগ করা হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার উদ্ধৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৮৮২ সাল ও ১৯৫১ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪,৭৩০টি লিনচিং-এর ঘটনা ঘটেছিল, যাতে বলি হয়েছিল ৩,৪৩৭ জন কৃষ্ণাঙ্গ ও ১,২৯৩ জন শ্বেতাঙ্গ।

এর বেশির ভাগ অপরাধীরই কোনও শাস্তি হয়নি, কারণ অপরাধীরা উপরোক্ত

গণতান্ত্রিক আইনব্যবস্থার সুযোগ পুরোমাত্রায় নিয়েছে। মার্কিন সংবিধানে 'ডিউপ্রসেস্ অফ ল' নামক যে রক্ষাকবচ আদালতে অভিযুক্ত সাধারণ মানুষের জন্য রয়েছে এবং পরিবর্তী বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যার ফলে তার চেহারা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা ভয়ানক কঠিন কাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কারণেই আমাদের সংবিধান তৈরির সময় ২১ অনুচ্ছেদ মার্কিন আদলে লেখা হওয়া সত্ত্বেও 'ডিউ প্রসেস্ অফ ল'-এর বদলে 'প্রসিডিওরএস্টাব্লিশড্‌বাই ল' লেখা হয়। এর ওপর আমেরিকায় আছে জুরির বিচার (একসময় আমাদের দেশেও ছিল)। যেসব জায়গায় লিনচিং-এর ঘটনা ঘটেছে সেসব জায়গায় পুলিশ ও জুরি, দুই-ই অপরাধীদের পক্ষে ছিল। বহু শ্বেতাঙ্গ এই রকম পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে ছিলেন (হার্পার লী-র অবিস্মরণীয় উপন্যাস 'টুকিল্এমকিংবার্ড' স্মর্তব্য), কিন্তু আইনি কাঠামোর বাঁধাবাঁধিকে ছাড়িয়ে তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারেননি।

সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্ব জুড়ে গণখুন আর এক ধরনের চেহারা নিয়েছে। যার মধ্যে আছে উগ্রপন্থীদের এলোপাতাড়িভাবে নিরীহ মানুষ খুন, যার অন্য নাম আতঙ্কবাদ বা উগ্রপন্থা (যেমন কাশ্মীর, মুম্বাইয়ের বোমা-বিস্ফোরণ), কোনও সংখ্যালঘু ধর্মের মানুষকে বেছে বেছে খুন (কাশ্মীর ও জম্মুতে হিন্দু খুন গুজরাতে মুসলমান খুন, পাকিস্তানে খ্রিস্টান খুন বসনিয়ায় মুসলমান খুন), একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে খুনোখুনি (বিহারে এবং অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ খুনোখুনি, পাকিস্তানের আহমেদিয়া খুন, উত্তর আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্ট পরস্পর খুন) আত্মহত্যার সঙ্গে খুন (কাশ্মীর, ইজরায়েল, এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনা), বিমান ছিনতাই ইত্যাদি।

এখানেও অপরাধীরা গণতান্ত্রিক আইনব্যবস্থার সুযোগ পুরোমাত্রায় নিয়েছে। উদাহরণ কাশ্মীরে বহু মানুষ খুনের অপরাধে অপরাধী পাকিস্তানী উগ্রপন্থী মাসুদ আজহার-এর বন্দিত্ব এবং পরবর্তীকালে কান্দহারে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমান ছিনতাইয়ের মাধ্যমে তার মুক্তি। পৃথিবীর যে-কোন স্বৈরতন্ত্রী বা টোটালিটেরিয়ান দেশে অনেক দিন আগেই মাসুদের মৃত্যুদন্ড কার্যকরী হয়ে যেত , কিন্তু ভারতের গণতান্ত্রিক আইনব্যবস্থায় তা সম্ভব হয়নি। বস্তুত, যখনই ভারতে বিশেষ কোনও আইন প্রণয়ন (মিসা, টাডা, পোটা ইত্যাদি) করে এই ধরনের উগ্রপন্থীদের আইনের ফাঁক দিয়ে বেরোনোর রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে, তখনই এক ধরনের ভোটলোভী রাজনীতিক 'ব্লিডিং হার্ট' রক্তাক্ত হৃদয় (এ ব্যাপারটা পরে বোঝানো হয়েছে) সেজে এব বিরুদ্ধে লাফালাফি করেছেন।

ধর্মের বা সংস্কারের আশ্রয় নিয়ে জনতার হাতে একক হতভাগ্যের খুন মধ্যযুগে বহু হত। জোয়ান-অফ্ আর্ক-কে খুন বা গ্যালেলিওকে খুনের ভয় দেখানোর ঘটনা সর্বজনবিদিত। গত শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত পুল বা বাঁধ বাঁধার জন্য 'ছেলে

পৌত্তা'র কাহিনী শোনা যেত। সতীদাহ বা নরবলিও এই শ্রেণীরই খুন। এখনও আদিবাসী সমাজে ডাইনি সন্দেহে খুনের কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যায়। সুখের বিষয়, ভারতে এ ধরনের পাপ দ্রুত মুছে যাচ্ছে। আজকের দিনে যে এরকম খুনকে নতুন করে আইনসিদ্ধ করা যেতে পারে তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে—কিন্তু এও যে হয়, তার প্রমাণ জিয়াউল হক-প্রবর্তিত পাকিস্তানের কুখ্যাত 'হুদুদ অর্ডিন্যান্স'। এই আইন অনুযায়ী, কোনও মহিলা যদি অভিযোগ করেন যে, তিনি ধর্ষিতা হয়েছেন তা হলে তাঁর সঙ্গে যৌনসংসর্গ যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য তাঁকে চার জন পুরুষ মুসলমান সাক্ষী হাজির করতে হবে। সাক্ষী নারী হলে চলবে না, অ-মুসলমান হলে চলবে না। চার জন সাক্ষী রেখে ধর্ষণের ঘটনা খুব কমই ঘটে। কিন্তু মহিলা যদি সাক্ষী জোগাড় না করতে পারেন তা হলে তার ধর্ষণের অভিযোগকেই বিবাহের বাইরে যৌনসংসর্গের স্বীকারোক্তি বলে ধরে নেওয়া হবে। এই পাপের নাম জীনা, এবং শাস্তির নাম হদ্দ্---অর্থাৎ সম্মিলিত জনতার হাতে ছোঁড়া পাথরের আঘাতে মৃত্যু। এর এক হৃদয়বিদারক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ইস্‌লামাবাদের কায়েদে-আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যার অধ্যাপিকা ডঃ ফরজানা বারী একটি প্রবন্ধে। সফিয়া বিবি নামক এক অন্ধ মহিলা তাঁর বাড়িওয়ালা ও তার ছেলেদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিলেন। নালিশ করার পরে চারজন সাক্ষী জোগাড় করতে না পারায় শরিয়তি আদালত তাঁকে হদ্দ্-এর আদেশ দেয়, এবং পাথর ছুঁড়ে তাঁকে খুন করা হয়।

আর এক রকমের খুনের ডি ফ্যাক্টো, বা কার্যত অধিকার জনতার থাকে তাদের বিরুদ্ধে, যাদের কারণে বা অকারণে অপরাধী বলে সন্দেহ করা হয়েছে, এবং যারা পুলিশের অক্ষমতা বা যোগসাজস সত্ত্বেও জনতার হাতে ধরা পড়ে গেছে। একে চালু ভাষায় গণপিটুনি বা গণধোলাই বলা হয়, এবং এর ফলে ধৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রায়ই মৃত্যু ঘটে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এর আবার একটি শ্রেণীচরিত্রও আছে। দেখা যায়, মোটর গাড়ির সঙ্গে কোনও রিকশা বা পথচারীর ধাক্কা লাগলে গাড়ির ড্রাইভারই মার খায়, কারণ এই রাজ্যের মার্কসীয় বাতাবরণে ড্রাইভার সবসময়েই শোষক, পথচারী সবসময়েই শোষিত, অতএব ড্রাইভারকে পেটানো একটা শ্রেণী-সংগ্রামী পদক্ষেপ।

এই অনেক লোক মিলে সামান্য কিছু লোককে খুনের অধিকারের সঙ্গে যোগ করতে হবে পুলিশের হাতে আসামি খুনের অধিকার, যার নাম মানবাধিকার হরণ। সাধারণত স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এবং তার মাধ্যমে অন্য অপরাধীদের হদিশ পাবার জন্য পুলিশ থানার মাধ্যে আসামিকে পেটায়, সারা পৃথিবী জুড়ে এই প্রথা বিদ্যমান, ইংরাজিতে এর নাম থার্ড ডিগ্রি। এর ফলে আসামির মৃত্যু ব্যাপারটা ব্যতিক্রমই, তার কারণ এই নয় যে, পুলিশ দয়ালু। কারণ হচ্ছে মৃত্যু হলে পুলিশকে

অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়, আর স্বীকারোক্তিও কোনও কাজে লাগে না। এমনিতে থানায় আদায় করা স্বীকারোক্তিও আদালতে ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু হদিশটা বিলক্ষণ কাজে লাগে। এই পেটানো কাজটা নিঃসন্দেহে আইনবিরুদ্ধ--কিন্তু কাজটা অন্যায় কিনা সে সম্বন্ধে এক বছর ধরে তর্ক করলেও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে কিনা সন্দেহ আছে। কারণ পাকা অপরাধীদের সঙ্গে সুভদ্র আলাপচারিতার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি যে পাওয়া যাবে না এটা ঠিক। পৃথিবী জুড়ে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এর প্রতিবাদ করেন, এঁদের নাম ব্লিডিং হার্টস বা রক্তাক্ত হৃদয়, কিন্তু সাধারণ মানুষ এঁদের বাতিকগ্রস্ত হিসেবেই দেখে। তবে পুলিশ হাজতে আর একটা কারণে নরহত্যা হয়, তার নাম প্রাণলোপ। এ সব সম্বন্ধে এই প্রবন্ধেই পরে আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বশেষে **(আইনসম্মত খুনিদের মধ্যে ধরতে হবে সেই সব গণখুনিকে, যারা রাষ্ট্রক্ষমতা হাতাবার পরে কোনও না কোনও কারণে, কিন্তু মূলত নিজের রাজত্ব নিষ্কন্টক করার জন্যে, সেই রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের দেশের নাগরিকদের খুন করেছে।)** এর মধ্যে আছেন অবশ্যই হিটলার (ইহুদি ও অন্যান্য খুন), স্তালিন (কুলাক্ খুন, ট্রটস্কি-বুখারিন্ প্রমুখকে খুন, কাতিন অরণ্যের খুন, গুলাগ-ধরনের কারাবাস যার অবধারিত ফল মৃত্যু), কাম্বোডিয়ার পল্ পত্ (এর কথা আগেই লেখা হয়েছে), ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো (কম্যুনিষ্ট খুন), সাদ্দাম হুসেন (কুর্দ -শিয়া খুন, নিজের জামাইকে নিজের হাতে খুন), সার্বিয়ার স্লোবোদান মিলোসেভিচ্ (বস্নিয়ার মুসলমান খুন), পাকিস্তানের লিয়াকত আলি খান, আজিজ আহমেদ (এর পরিচয় পরে), টিক্কা খান, জেনারেল নিয়াজি ও ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে স্থিত অন্যান্য পাকিস্তানি সেনানায়কেরা (হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান খুন)। এই প্রবন্ধের শিরোনামা মাথায় রেখে এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, এই সব রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গণখুনিদের মধ্যে অনেকেই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনি, অনেকে আবার ঘোষণাই করে দিয়েছিল যে, তাদের রাষ্ট্র এসব লোকের (যাদের খুন করা হল বা হবে তাদের) জন্য নয়। এবং আশ্চর্যের বিষয়, এই সব গণখুনিদের যারা সমর্থক, বা যারা এদের দোষ ঢাকতে উৎসাহী তারা এই ঘোষণাকেই খুনের যুক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করে।

এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হবে, যে সরল খুন, যেমন একটি বা দুটি লোক একজনের টাকাপয়সা হাতাবার জন্য তাকে খুন করল এমন খুনের অধিকার, বা প্রেমের ত্রিভুজজনিত খুনের অধিকার, গণতন্ত্রে কারোওপরই থাকতে পারে না। অধিকার পেতে গেলে বহু লোক মিলে এক বা কতিপয় মানুষকে খুন করতে হবে,

এবং /অথবা সেই খুনের ওপর এক বা একাধিক বিশেষ মোড়ক লাগাতে হবে। নিরন্তর প্রচারের মাধ্যমে সেই মোড়ক ও খুনকে গ্রহণযোগ্য করতে হবে, এমনকি সাধারণ মানুষের মূল্যবোধকে বদলে ফেলতে হবে। এই মোড়কগুলি সাধারণভাবে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক, অনেক সময় দুটোই। এ ধরনের খুনে যত বেশি লোককে প্ররোচিত করা যাবে প্ররোচকের বা খুনিদের দায়িত্ব তত কমবে। একটা বিন্দু পার হয়ে গেলে খুনিদের পরিচয় বদলে হয়ে যাবে বিপ্লবী জনতা, প্ররোচকের পরিচয় হয়ে যাবে জননায়ক। মহম্মদ আলি জিন্না, হুসেন সোহরাওয়ার্দি, গোলাম সারোয়ার (এর পরিচয় পরে), শ্রীলঙ্কার প্রভারকণ, বস্‌নিয়ার রাদোবান কারাদিচ্‌, ওসামা বিন লাদেন এই জাতের খুনি।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার গত এবং এই শতাব্দীতে বাংলায় (অবিভক্ত, পূর্ব ও পশ্চিম) ঘটে যাওয়া কিছু গণখুনের ঘটনা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। যে-ঘটনাগুলি বিবেচনা করে দেখা হবে তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল। যে-ঘটনাগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সেগুলির ঘটনাস্থল ও পাত্রপাত্রী আমাদের অত্যন্ত চেনা এবং প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ এখনও বেশ কিছু আছেন।

১। কলকাতার দাঙ্গা (গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্), অগাস্ট ১৯৪৬

২। নোয়াখালির গণহত্যা ও গণধর্ষণ, অক্টোবর ১৯৪৬

৩। পূর্ববাংলা জুড়ে গণহত্যা ও গণধর্ষণ, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৫০

৪। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গণখুন ১৯৭১

৫। বর্ধমান সাঁইবাড়ির হত্যাকান্ড, ১৯৬৯

৬। নকশাল আমলের হত্যা ও পাল্টা হত্যা, ১৯৬৭-৭৫

৭। বালিগঞ্জ বিজন সেতুতে আনন্দমার্গী সাধু হত্যা, ১৯৮২

৮। বিনোদ মেহতা, মোক্তার আলি ও ইদ্রিস আলি হত্যা, ১৯৮৪

৯। বানতলা, নানুর, ছোট আঙারিয়া প্রভৃতির হত্যাকান্ড, ১৯৯৬-২০০১

১০। সাম্প্রতিক 'জনযুদ্ধ' ও কামতাপুর আন্দোলনকারিদের হত্যাকান্ড ২০০১ ও পরবর্তী।

বাংলার পাইকারি হারে খুনের রাজনীতির সূত্রপাত ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতার দাঙ্গা বা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্ থেকে, যা নিঃসন্দেহে ভারতের কেন, পৃথিবীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসে বীভৎসতম। এই দাঙ্গা চলেছিল মোটামুটি চার দিন ধরে, ১৬ থেকে ১৯ আগস্ট এবং এই চার দিনে নিহতের সংখ্যা আনুমানিক ১৭,০০০। সংখ্যাটি আনুমানিক, কারণ বহু মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, বা ম্যানহোলের মধ্যে ঠুসে দেওয়া হয়েছিল। এই দাঙ্গার আরও বৈশিষ্ট্য, অন্য বহু দাঙ্গার মতো এটি কিন্তু ধর্মস্থানের সামনে বাজনা বাজানো, বা কোনও মেয়েকে দেখে টিটকিরি করার মতো অকিঞ্চিৎকর, আকস্মিক ঘটনা দিয়ে আরম্ভ হয়নি। এটি

একটি সুচিন্তিত, পরিকল্পিত রাজনৈতিক পদক্ষেপ, একটি ষড়যন্ত্রের সফল রূপায়ণ। এর পরিকল্পকের নাম হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী, যার পেছনে সম্মতি ও আশীর্বাদ ছিল মহম্মদ আলি জিন্নার; আর যারা হাত গুটিয়ে বসে এই দাঙ্গাকে সম্ভব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানদের নাম--বাংলার তদানীন্তন গর্ভনর বা 'ছোটোলাট', ব্রিটিশ-রেলের প্রাক্তন গার্ড স্যার ফ্রেডরিক্ বারোজ এবং ফোর্ট উইলিয়ামের সেনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জে পি সি ম্যাকিন্‌লে।

কলকাতার দাঙ্গার মতো ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে বহু কিছু লেখা হওয়া স্বাভাবিক, হয়েওছে, কিন্তু তার বেশির ভাগই ইংরাজিতে। যে সামান্য বাংলা লেখা রয়েছে তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে নিরপেক্ষ ও তথ্যবহুল লেখা লিখেছেন অশোক মিত্র, তাঁর অত্যন্ত সুখপাঠ্য আত্মজীবনী 'তিন কুড়ি দশ' -এর তৃতীয় খন্ডে, আর একটি লেখা ভবনীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'দেশবিভাগ; পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী'। এই অশোক মিত্র কিন্তু আই. সি. এস্. ও জনসংখ্যাবিদ অশোক মিত্র কিংবা অর্থনীতিবিদ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র নন। কেন বাংলায় তেমন লেখা হয়নি? কারণ এই বাংলায় যাঁরা নিজেদের 'সেকুলার' বলেন তাঁরা কিছু সুবোধ্য কারণে এই ঘটনাবলী আজকের মানুষ আদৌ না জানুন, তা-ই চান। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বললে নাকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন হতে পারে! ইতিহাস চেপে যাবার এই বিচিত্র যুক্তি শুধু আত্মবিস্মৃত বাঙালির পক্ষেই সম্ভব। আশ্চর্যের বিষয়, যদিও এই দাঙ্গার নেতা ও প্রণেতা সোহরাওয়ার্দি পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তবু বাংলাদেশের মানুষ এই অদ্ভুত শুচিবাতিকে অনেক কম ভোগেন। উদাহরণ, মিজানুর রহমানের লেখা 'কৃষ্ণ ষোলোই'। কিংবা আবুল মনসুর আহমেদের আত্মজীবনী 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ রছর'। এই বইগুলিতে বিস্তারিত বিবরণ আছে। যাঁরা এই দাঙ্গা সম্বন্ধে আরও জানতে উৎসুক তাঁরা এই বইগুলি পড়ে দেখতে পারেন। এই দাঙ্গার বীভৎসতা বোঝাবার পরিসর এখানে নেই।

এই দাঙ্গায় সোহরাওয়ার্দির দায়িত্ব খর্ব করার কোনও সুযোগ নেই, কারণ জিন্না পাকিস্তান দাবির সমর্থনে 'ডিরেক্ট অ্যাকশন', প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই সোহরাওয়ার্দি দাঙ্গাকারীদের সুবিধার জন্য বাংলা সরকারের তরফ থেকে ১৬ আগাস্টে ছুটির দিন ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। সেদিন সকালবেলা গড়েরমাঠে মুসলিম লিগ যে জনসভা ডাকে তাতে যে-জনতা যোগ দিয়েছিল তারা লাঠি, সড়কি, বন্দুক, বল্লমে সজ্জিত হয়েই এসেছিল। সোহরাওয়ার্দি প্রচন্ড উত্তেজক বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের বলেছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পুলিশ মিলিটারি যাতে কিছু না বলে সেটা উনি দেখবেন বলেছিলেন, দেখেওছিলেন। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি খুনের পেছনে একক ব্যক্তিত্বের তালিকা তৈরি করলে তার শীর্ষে নিঃসন্দেহে স্থান হবে মরহুম হুসেন

শহীদ সোহরাওয়ার্দির। অথচ এই গণখুনের সাত-আট মাসের মধ্যে এই সোহরাওয়ার্দিরই সঙ্গে ভিড়েছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ তাবড় তাবড় নেতারা, 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' নামক আকাশকুসুমের সন্ধানে। হিন্দু বাঙালির পরম সৌভাগ্য, শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় সে-অভিশাপ জাতির কপালে আসেনি। এক বছর পরে যখন দেশ ভাগ হল ও স্বাধীন হল তখন সোহরাওয়ার্দি কিন্তু ঢাকা চলে যাননি, কলকাতাতেই ছিলেন—শোনা যায় নিজের প্রভূত বেনামী সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করতে। গাঁধীজি সেদিন দিল্লি ছেড়ে কলকাতায়, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিখ্যাত ও বহুশ্রুত 'ওয়ান-ম্যান বাউন্ডারি ফোর্স (সত্যি, সহেবরা আমাদের কারও প্রশংসা করলে আমরা কেমন পুলকিত হই!), বেলেঘাটায় অবস্থানরত। এই সতেরো হাজার নিরাপরাধ মানুষের কুখ্যাত খুনিকে (সঙ্গে কলকাতার প্রক্তন মেয়র, খুনের আর এক হোতা, এস্.এন.ওস্‌মান-সদৃশ কিছু স্যাঙাত সহ) নিজের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে, পরে তাঁকে নিরাপদে পাকিস্তানে যেতে দিয়ে, গাঁধীজি নিজেকে মহাত্মা প্রমাণ করে ছাড়লেন।

অগাস্ট মাসে কলকাতার হত্যাকান্ডের পরেই অক্টোবর মাসে নোয়াখালির হত্যালীলা। এটা দাঙ্গা নয়, একতরফা খুন, নারীধর্ষণ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরকারণ। এর হোতা ছিল গোলাম সারোয়ার নামের এক খুচরো রাজনীতিক, যাকে কোনও কারণে সেবার মুসলিম লিগ নির্বাচনে টিকিট দেয়নি। গোলাম সারোয়র তখন ঠিক করেছিল ওই ভূখন্ডের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (পড়ুন মূলত হিন্দু) হত্যা করে সে বাংলার রাজনীতিতে জায়গা করে নেবে। সে সময়কার নিরিখে হত্যা সে বেশি করেনি—বড় জোর হাজারখানেক হতে পারে। কিন্তু সব ছাপিয়ে গিয়েছিল নারীধর্ষণ। নোয়াখালি জেলা ও তৎসংলগ্ন ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর অঞ্চলের কোনও হিন্দু নারী সে সময় অধর্ষিতা থাকেনি বলেই মনে করা হয়।

নোয়াখালির গণহত্যা ও গণধর্ষণ সম্বন্ধে কিন্তু বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে, কারণ গাঁধীজি সেখানে গিয়ে জায়গাটাকে বিশ্ববিখ্যাত করে দিয়েছেন। গাঁধীজি নোয়াখালি গিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন, টুমচর লামচর কাজিরখিল আতাখোরা বেগমগঞ্জ নামধারী পান্ডববর্জিত সব গন্ডগ্রামে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছিলেন, সভা করেছিলেন, মানুষকে অহিংসার বাণী পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। নিট্ ফল শূন্য। অত্যাচারীদের মন ফেরাতে পারেননি, তারা তাঁর যাবার রাস্তায় বিষ্ঠা ও কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে রাখত। অত্যাচারিত হিন্দুদেরও নিজের গ্রামে ফিরে যাবার সাহস দিতে পারেননি তিনি।

কলকাতার দাঙ্গা ও নোয়াখালির গণহত্যা ও গণধর্ষণ দুইই পূর্বোক্ত সংখ্যাধিক্য, কল্পিত অভিযোগ ও অন্ধবিশ্বাসের ত্র্যহস্পর্শের ফল। এর সঙ্গে

যোগ হয়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের, বা পুলিশের ক্লীবতা। বস্তুত, ব্রিটিশ সরকার তখন একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত, অন্যদিকে ভরতের স্বাধীনতার দাবিতে জেরবার হয়ে প্রশাসন চালাবার ইচ্ছেই যেন হারিয়ে ফেলেছিল। এর সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহারও ছিল, কারণ সরকারের মাথা ব্রিটিশ হলেও পুলিশের কর্তৃত্ব অনেকাংশেই নির্বাচিত সরকারের (সে সময় মুসলিম লিগ সরকারের) হাতে ছিল--এবং এই কর্তৃত্বের অপব্যবহার যে তিনি করবেন একথা সোহরাওয়ার্দি ময়দানের ভাষণেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য গণখুনি সোহরাওয়ার্দি, ওস্‌মান বা গোলাম সারোয়ারের কোনও শাস্তি হয়নি। এ ধরনের অপরাধের শাস্তি সাধারণ আদালতে সম্ভব নয়, এর জন্য নুরেমবার্গ-ধরনের বিচারসভা প্রয়োজন। একে তো সে সময়ের রাজনৈতিক বাতাবরণে ও ধরনের বিচারসভা অসম্ভব ছিল। ফল হয়েছে, সতেরো হাজার মানুষ খুন করে বা করিয়ে সোহরাওয়ার্দি প্রমুখরা ড্যাঙডেঙিয়ে পাকিস্তান চলে গেছেন।

নোয়াখালি হত্যা-ধর্ষণকান্ডের মতোই, পূর্ববাংলার (তখন ওই নামই ছিল, পরে পূর্ব পাকিস্তান হয়) ১৯৫০-এর হত্যাকান্ডকে সাধারণভাবে 'ফিফ্‌টির রায়ট' বলা হলেও এটা কোনও অর্থের রায়ট বা দাঙ্গা নয়। এটা একটা দেশের (অর্থাৎ পূর্ব বাংলার) ঊনত্রিশ শতাংশ লোককে দেশছাড়া করবার একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। এই চক্রান্তের প্রধান নায়ক ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁন এবং রূপায়ণ করেছিলেন পূর্ববাংলার মুখ্যসচিব আজিজ আহমেদ।

যেহেতু এই নিবন্ধের বিষয় চেপে-রাখা-ইতিহাস মন্থন নয়, খুনের রাজনীতির বিশ্লেষণ, তাই খুনের প্রসঙ্গে আসতে হবে। এই সময় পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় আইন ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন মুসলিম লিগের যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। পূর্ব বাংলায় ব্যাপক হারে গণখুন শুরু হয়েছে খবর পেয়ে তিনি তখনকার রাজধানী করাচি থেকে ঢাকা চলে আসেন ও তারপর নিজের জেলা বরিশালে যান। বরিশালের ও পূর্ববাংলার অন্যান্য জায়গার ভয়াবহ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি করাচি ফিরে যান ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত্‌ আলি খ্‌নকে ঘটনার বিররণ জানান। উত্তরে লিয়াকত্‌ আলি তাঁকে বলেন যে যোগেনবাবু সব বাড়িয়ে বলছেন, এবং আর যদি বেশ বাড়াবাড়ি করেন তবে তাঁকে জেলে পুরে দেওয়া হবে। এরপর যোগেনবাবু আর কথা না বাড়িয়ে ঢাকায় আসেন, তারপর চুপিচুপি ভারতে পালিয়ে যান এবং কলকাতা থেকেই পদত্যাগপত্র পাঠান। যোগেনবাবুর সেই ৮ অক্টোবর ১৯৫০ তারিখের পদত্যাগপত্র অনুযায়ী শুধু বরিশাল জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল, পটুয়াখালি, ফিরোজপুর,

ঝালকাটি, ভোলা ও বরগুনা জেলার সমষ্টি) আড়াই হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। মুলাদি, মাধবপাশা, লাকুটিয়া প্রভৃতি জায়গা এখনও গণখুনের জন্য কুখ্যাত হয়ে আছে। সমস্ত পূর্ববাংলা ধরলে খুনের সংখ্যা যোগেনবাবুর হিসেবে দশ হাজারের কাছাকাছি। যোগেনবাবুর এই পদত্যাগপত্র সম্প্রতি চটি বই আকারে প্রশাশিত হয়েছে।

এর মধ্যে নামে গণতন্ত্রী পাকিস্তানী রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা কী ছিল? তারা কি নিজের দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকদের বাঁচাবার কোনও চেষ্টাই করেনি? আগেই বলা হয়েছে এই গণখুন ব্যাপারটা পুরোপুরি পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পিত, অতএব সে রকম কোনও চেষ্টা করার প্রশ্নই ওঠে না। বরঞ্চ, ৬-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ তারিখে রেডিও পাকিস্তান কলকাতায় সংখ্যালঘু-নিধনের সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও চরম প্ররোচনামূলক কাহিনী প্রচার করে গণখুনে উৎসাহ দিয়েছিল। রাষ্ট্রক্ষমতার এমন নির্লজ্জ এবং পৈশাচিক অপব্যবহার হিটলার-পল্ পতের সঙ্গেই তুলনীয়--অথচ পরম আশ্চর্যের বিষয়, যাঁরা অত্যাচরিত হয়ে এদেশে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁরাই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এই অত্যাচারের কাহিনী ভুলতে ও ভুলিয়ে দিতে।

একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কথা পৃথিবীর মানুষ কিছু জানেন, কারণ সে সময় বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু বাঙালি- মুসলমান সম্প্রদায়েরও বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। সুখের বিষয়, বাঙালি মুসলমানেরা সে ঘটনা লুকোবার চেষ্ঠা করেননি, যেমন করেছিলেন হিন্দুরা। রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহারের নৃশংসতায় ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর ঘটনা (বিশেষত ঢাকা বিশ্ববদ্যালযের জগন্নাথ হলে গণহত্যা) হিটলার - স্তালিনকেও ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি হামদুর রহমানকে নিয়োগ করেছিলেন এই ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য। হামদুর রহমান কমিশন দুই দফা রিপোর্ট পেশ করে। এর মধ্যে প্রথম রিপোর্ট এতই বিস্ফোরক ছিল যে, ভুট্টো নিজে দাঁড়িয়ে এর প্রতিটি কপি পুড়িয়ে ফেলেন। রিপোর্টের দ্বিতীয় দফাটি কোনওক্রমে সরকারের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। ১৫ অগাস্ট ২০০০ 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণে এর অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়।

হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বা জগন্নাথ হলের গণহত্যা , কোনোটির সম্বন্ধেই সবিস্তারে লেখবার পরিসর এখানে নেই, দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানি বিভাগের মালি চান্দ দেবরায় গণখুনের মধ্যে পড়ে আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন, বহু রক্তাক্ত মৃতদেহের স্তুপের মধ্যে অনেকক্ষণ পড়েছিলেন। তাঁর জবানীতে , খোলা কল থেকে জল

মাটিতে পড়লে যেমন শব্দ হয় মাটিতে নর রক্ত পড়ার তেমন শব্দ তিনি শুনেছেন। হলের ছাদের কার্নিশে ছেলেদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে পেছন থেকে গুলি করে নীচে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারটা নীচে দাঁড়ানো সৈন্যরা বেশ উপভেগ করেছিল। হামদুর রহমান রিপোর্ট অনুযায়ী কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কয়েকশ' বাঙালী অফিসার ও সৈন্যকে (সবাই মুসলমান) এক পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারের আঙুলের ইশারায় হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের মে মাসে হিন্দু হত্যা করার জন্য ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ মালিক লিখিত আদেশ দিয়েছিলেন!

এবার পূর্ব ছেড়ে পশ্চিমে ফেরা যাক। ১৯৬৭-৭২ সাল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি জলবিভাজিকা বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। পূর্ববর্তী কুড়ি বছর ধরে ব্রিটিশ আমলের যা কিছু পরম্পরা চলছিল এই সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতার ধাক্কায় তা ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর মধ্যে অন্যতম বলি হয় উপরোক্ত 'রুল অফ ল', বা আইনের শাসন। এই সময়ের মধ্যে দু-দুবার যুক্তফ্রন্টের অন্যতম প্রধান শরিক হয়ে মার্কস্‌বাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। । আগেই বলা হয়েছে, কম্যুনিস্টরা ভারতীয় ধরনের গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে একটিই পার্টি থাকার কথা , তার নাম কম্যুনিস্ট পার্টি। এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোতি বসু সেদিন বলেছিলেন, উই শ্যাল্‌ রে্‌ক দা কনস্টিটউশন ফ্রম উইদিন , আমরা ভেতর থেকে সংবিধানকে ধ্বংস করে দেব। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছিলেন প্রয়াত নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার। তখন অজয় মুখোপাধ্যায়ের বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মার্কস্‌বাদী কম্যুনিস্ট পার্টির শরিকি ঝগড়া সবে শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে **(হরেকৃষ্ণবাবু বলেছিলেন, ওঁরা [বাংলা কংগ্রেসিরা] চান আগে আইনটা তৈরি হোক, তারপর জনগণ সে পথে যাবেন। আমরা বলি তা কেন? জনগণ যে পথে যাবেন সে পথেই আইন তৈরি হবে। রুল অফ ল, বা আইনের শাসনকে এমন পরিষ্কার ভাষায় অর্ধচন্দ্র দেবার কাজ এর আগে কেউ কখনও করেননি। এই দর্শনেরই প্রথম ফলিত প্রকাশ সাঁইবাড়ীর খুনের মধ্যে দিয়ে।)**

বর্ধমান শহরের সাঁইবাড়ির খুন,খুন হিসেবে খুব বিরাট কিছু নয়। সি পি আই (এম)-এর এক টাঙি-বল্লমধারী মারমুখো মিছিল প্রকাশ্য দিবালোকে মলয় এবং প্রণব সাঁই নামক দুই কংগ্রেস সমর্থক ভাইয়ের বাড়ি চড়াও হয় এবং

তাদর খুন করে তাদের রক্ত তাদেরই মায়ের গায়ে ছিটিয়ে দেয়- এই মাত্র। দিন দুয়েক বাদে গুণমনি রায় নামের আর এক কংগ্রেস সমর্থককেও খুন করা হয়। এই খুনের দায়িত্ব সি পি আই (এম) অস্বীকার করেনি, বরঞ্চ হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছিলেন, সি পি আই (এম)-এর মিছিলে যে বাধা দিতে আসবে তার ওই অবস্থাই হবে। এর কিছু অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকার ১৯৭২সালে ক্ষমতায় এসে খুনের মামলা রুজু করে, কিন্তু ১৯৭৭ পর্যন্ত সে মামলা বেশি দুর এগোয়নি। ১৯৭৭-এ আবার ক্ষমতায় এসে সি পি আই (এম) এই মামলা তুলে নেয়, তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসও তখন কিছু প্রতিবাদ করেনি। ইতিমধ্যে সে সময় যে - রাজপুরুষটি বর্ধমানের জেলাশাসক ছিলেন, এবং খুনের সময় অকুস্থল থেকে অল্প দুরে চুপচাপ বসেছিলেন তিনি যথারীতি প্রমোশন পেয়ে রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ পদ, অর্থাৎ মুখ্যসচিব পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং অবসর গ্রহণের পরেও নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন।

সাঁইবাড়ির খুন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।'সবার উপরে কেউ নয়' অর্থাৎ রুল অফ ল-এর তত্ত্ব সাঁইবাড়ির খুনের পরই পশ্চিমবঙ্গে পাকাপাকিভাবে বাতিল হয়ে গেল। নয়া তত্ত্ব হল , 'সবার উপরে পার্টি, পার্টির উপরে কেউ নয়'- অন্তত যতক্ষণ সি পি আই (এম) ক্ষমতায় আছে। এ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে যে- আইন সেটাই সাচ্চা বিপ্লবী আইন। এ ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের কাগজে-কলমে চালু আইন ব্যবস্থার কোনও সম্পর্কই নেই। প্রচলিত আইন 'পার্টির দৃষ্টিতে বুর্জোয়া আইন' একটা অচলায়তন , তাতে খুন বারণ মানে একেবারেই বারণ, এই ধরনের আইনে খুনকে কিছুতেই আইনসম্মত করা যাবে না। অপরপক্ষে পার্টি 'সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে সামগ্রিক রাজনৈতিক দৃষ্টি'- তে দেখে থাকে (যেটা অনেক নমনীয় ব্যাপার), এবং 'প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত' নিয়ে থাকে। সেখানে 'রাজনৈতিক প্রয়োজনে' খুন করতে হলে করতে হবে, ধর্ষণ করতে হলে করতে হবে। ওকরম বুর্জোয়া দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখলে চলবে না কমরেড।

তাই প্রয়োজনে সাঁইবাড়িতে খুন করা হয়েছিল, তাই বালিগঞ্জ বিজন সেতুতে আঠারো জন আনন্দমার্গী সাধুকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। যাঁরা মিশনারি স্টেইনস্ পরিবারের জঘন্য হত্যা নিয়ে চিল চিৎকার করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু এই আনন্দমার্গী হত্যার কথা শুনলে এদিক ওদিক তাকান। তাই তরুণ আই পি এস্ অফিসার, ডিসি (পোর্ট) বিনোদ মেহতা ও তাঁর দেহরক্ষী মোক্তার আলিকে প্রথমে খুন করিয়ে তারপরে অভিযুক্ত ইদ্রিস আলিকে লালবাজারে লক-আপে প্রমাণলোপের জন্য খুন করা হয়েছিল তাই তিলজলা থানার বড়বাবু গঙ্গাধর ভট্টাচার্যকে থানার মধ্যেই খুন করা হয়েছিল , বানতলার

দুজন সরকারী মহিলা কর্মীকে ও তাঁদের ড্রাইভারকে খুন করা হয়েছিল, বীরভূমে নানুরের সুচপুরে এগারোজন গরিবস্য গরিব ক্ষেতমজুরকে খুন করা হয়েছিল। তাই গড়বেতায় একজন মন্ত্রীর সরকারি গাড়িতে করে বেআইনি বন্দুক পাচার হয়েছিল, উদ্দেশ্য' গুলি চালিয়ে পার্টি বিরোধীদের খুন বা 'গ্রামছাড়া করা । তাই ছোট আঙারিয়ায় শুধু খুন করে লাশ গায়েবও করা হয়েছিল। তাই 'পার্টির মেয়ে ' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক , মণীষা মুখ্যোপাধ্যায় 'বেশি জেনে ফেলে ' হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন, তাঁর লাশও পাওয়া গেল না। তাই সি পি আই (এম)- এর সদর দপ্তরের ক্যাশিয়ার সুশীল মুখ্যোপাধ্যায় ওরফে জ্যাঠামশাইয়ের গলিত মৃতদেহ ধাপার মাঠের পচা খালে পাওয়া গেল, মৃত্যুর কোনও কিনারা হল না।

প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বুর্জোয়া আইন শুধু আইনের শাসনের কথা বলে না , এও বলে যে, আইনের চোখে সবাই সমান। কিন্তু 'সবার উপরে পার্টি' তত্ত্বের ওপর যে-আইনের চোখে তো পার্টি - সমর্থক আর পার্টি-বিরোধী সমান হতে পারে না। অথচ কেন্দ্রে ক্ষমতায় না যেতে পারায় বুর্জোয়া আইন বাতিল করে সাচ্চা বিপ্লবী আইন চালু করাও যাচ্ছে না- যে- আইনের বলে ট্রটস্কি-বুখারিনের মতো পার্টি - বিরোধীদের যথারীতি বিচার করে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া যাবে। তাই প্রয়োজনে খুন করতেই হবে, কিন্তু পার্টির নির্দেশে। পার্টির নির্দেশ পেলে তবেই এই গণতন্ত্রে খুণের অধিকার জন্মাবে।

এই নীতি কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নীতিও কিন্তু সি পি আই (এম)-এর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কায়েম হয়ে গেল। 'আইনের চোখে সবাই সমান' আর 'পার্টির নির্দেশে খুন , খুন নয়' এই দুটো নীতি জগাখিচুড়ি হয়ে দাঁড়াল।, 'কোনও রাজনৈতিক খুনই খুন নয়'। অতএব রাজনৈতিক খুনের অধিকার এই গণতন্ত্রে সর্বদাই থাকবে। এটা সি পি আই (এম)-এর পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ যতক্ষণ না দেশে এই পার্টির আইনত বা ডি জুরে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে (যার কোনও আশু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না) ততক্ষণ এই ধরনের খুনের অধিকার শুধু এক দলের থাকবে, অন্য দলের থাকবে না, এটা জনসাধারণকে বোঝানো অসম্ভব। তাই সি পি আই (এম)-নেতৃত্বাধীন সরকার সকলকেই কার্যত এই অধিকার দিয়ে দিল।এরই রূপায়ণে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন সরকারে এল, সমস্ত নকশাল বন্দিদের এবং শতাধিক 'রাজনৈতিক আসামি'কে এক বাক্যে জেল থেকে ছেড়ে দিতে হল কারণ তারা রাজনৈতিক বন্দি মাত্র, খুনি তো নয়।

এবার একটা প্রশ্ন উঠে আসে। যে - খুন সি পি আই (এম) এত বছর ধরে করে এসেছে, আর যে - খুন সত্তরের দশকে নকশালরা করেছিল এই দুটোর

মধ্যে তফাত কি? তফাত এই যে, সি পি আই (এম)-এর খুন হচ্ছে সব দিক বিবেচনা করে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিয়ে, শুধু যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু খুন। এই খুনের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তার ছাপ আছে, পরিণত বুদ্ধির ছাপ আছে, পরিকল্পনার ছাপ আছে। এ ধরণের এক-একটি খুন যেন-একটি মাপা পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে পার্টি নিজের 'কাজ বাড়াচ্ছে', পার্টি এগিয়ে যাচ্ছে। আর সত্তরের নকশালি খুন (সে সময়কার ভাষায় 'খতম') ছিল একটা এলোপাতাড়ি, রক্তোন্মাদ, বুদ্ধিহীন প্রক্রিয়া। এর শেষটা জানা ছিল--চিনের চেয়ারম্যানকে আমাদের চেয়ারম্যানের আসনে বসানো এবং তারপর চিনের পথে চলা--কিন্তু 'খতম', অর্থাৎ প্রধানত সম্পন্ন চাষি, মধ্যবিত্ত চাকুরে, স্কুলমাস্টার, হোমগার্ড ও ট্র্যাফিক পুলিশ খুনের মাধ্যমে এই মহৎ কার্য কি করে সমাধা হবে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তিকে কি করে মোকাবিলা করা যাবে, তার কোনও ম্যাপ কারও সামনে ছিল না। মনে হয়, এই অভাবটা নকশালদের 'শ্রদ্ধেয় নেতা' চারু মজুমদারকেও ভাবিয়েছিল, কিন্তু সমাধান তিনিও খুঁজে পাননি, না পেয়ে বলেছিলেন "সারা ভারত আজ বিপ্লবকে পেটে নিয়ে গর্ভযন্ত্রণায় ছটফট করছে আমাদের কাজ ধাত্রীর ভূমিকা পালন করা" (উদ্ধৃতিতে সামান্য ভুল হতেও পারে, যে-বয়স্ক নেতাটি অ্যাজমায় চব্বিশঘন্টা ভুগতেন, কলকাতা আর শিলিগুড়ি -সন্নিহিত অঞ্চল ছাড়া যাঁর আর কিছুই দেখা ছিল না, তিনি কি করে সারা ভারত সম্বন্ধে বিছানায় শুয়ে এত কিছু জেনে ফেললেন তা তিনিই জানেন। তবে তাঁর জানার ফল হয়েছিল বহু মায়ের কোল খালি হয়ে যাওয়া, বহু তরুণীর বিধবা হয়ে যাওয়া। এবং শেষপর্যন্ত অষ্টরম্ভা--চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান হতে পারলেন না। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারকে ফেলে দেওয়ার সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টা একটা ইউটোপিয়ার জন্ম দিয়েছিল মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। আসলে তা ছিল খুনের রাজনীতি, এক উদ্দেশ্যহীন অরাজকতা সৃষ্টির আপ্রাণ প্রয়াস। অপর পক্ষে মাপা খুনের রাজনীতি করে, আইনের শাসন তুলে দিয়ে পার্টির শাসন কায়েম করে, আজ প্রায় ছাব্বিশ বছর সি পি আই (এম) ক্ষমতায় আসীন।

বলা হয়ে থাকে, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পুলিশের চণ্ডনীতির ফলেই নাকি নকশাল আন্দোলন দমন করা গেছে তা না হলে এই আন্দোলন ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলে চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারত। এ কথাটা আংশিক সত্য, পুরোপুরি নয়। পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের পেছনে ব্যাপক জনসমর্থন কখনওই ছিল না, নেতৃত্বও অত্যন্ত অপরিণত, তার ওপর এর ভেতরে প্রচুর সমাজবিরোধী ঢুকে গিয়েছিল। **(শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজের কিছু প্রতিভাবান আগুনখেকো বালক দিয়ে বৃহৎ কিছু করা যায় না,**

মহৎ তো যায়ই না। ফলে কিছুই হয়নি, চারু মজুমদারের প্ররোচনায় বালকদের সমস্ত আত্মদান মাঠে মারা গেছে।) আর নন্দলাল-নীতি নিয়ে যারা আত্মদান করেনি, এখনও বেঁচে আছে, তারা এখন অনেকেই সি পি আই (এম)-এর চাটুকারিতা করে জীবন কাটায়, বিনিময়ে মাস গেলে সামান্য কিছু পায়।

পুলিশের চন্ডনীতির কথা আগেই বলা হয়েছে। এই ধরনের উগ্রপন্থী দমন করতে হলে, পোড়খাওয়া অপরাধীদের থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের মতোই, সুভদ্র আলাপচারিতার মাধ্যমে তা করা যাবে না। তবে নকশালদের ব্যাপারে পুলিশের বাড়াবাড়ির আর একটি কারণ হচ্ছে, নকশালদের পুলিশ খুন। যে-সহকর্মীটির সঙ্গে আমি নিত্য ওঠাবসা করি, যে আমার পাশের কোয়ার্টারে থাকে, যার ছেলেমেয়েরা আমাদের বাড়ি রোজ খেলতে আসে, তাহলে কি আমার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জাগ্রত হবে না? নিশ্চয়ই হবে, শরীরে মানুষের রক্ত থাকলে হবেই। পুলিশ খুনের বুদ্ধিটা কোন্ নকশাল নেতার মাথা থেকে বেরিয়েছিল জানি না, তবে তিনি যেই হোন, তিনি শুধু খুনি নন, গর্দভও। চন্ডনীতির প্রয়োগ পাঞ্জাবে কে পি এস্ গিলও করেছিলেন, 'বাংলায় দেবী রায়, রুণু গুহ নিয়োগীও করেছেন। আগে এও বলা হয়েছে যে, এই কাজের নৈতিকতা বিচার একরকম অসম্ভব। এর জন্য কোনও পুলিশ অফিসারকে জেলে পাঠানোর দরকার নেই, যেমন করা হয়েছিল পাঞ্জাবের তরনতারনের প্রাক্তন এস্ এস্ পি অজিত সিং সান্ধুকে, যার ফলে সান্ধু পরে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেন; আবার কারওকে শৌর্যপদক দেবারও দরকার নেই। পুলিশকে পুলিশের মতো করে পুলিশের কাজ করতে দিলেই হবে।

আজ সি পি আই (এম)-এর সুচিন্তিত, পরিশীলিত, পরিণত রণনীতি স্বখাত সলিলে পড়েছে। এই সলিলের নাম পুলিশকে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনীতি করানো। পৃথিবীর কোথাও অস্ত্রধারী ইউনিয়ন করার অধিকার দেওয়া হয় না। কিন্তু এটা যে পশ্চিমবঙ্গ, এখানে পার্টির রাজ কায়েম করবার জন্য এটা করতেই হবে! মেদিনীপুরের জনযুদ্ধ বা ধূপগুড়ির কামতাপুরীরা এমন কিছু ভয়ঙ্কর সংঘবদ্ধ শক্তি নয়। আজ দেবী রায়, রঞ্জিত গুপ্ত বা রুণু গুহ নিয়োগী থাকলে পুলিশ সম্ভবত দু দিনে তাদের হাঁড়ির খবর বার করে তাদের শায়েস্তা করার পথে এগিয়ে যেতে পারত। **কিন্তু তাঁরা আলিমুদ্দিনে যতটা নিবেদিতপ্রাণ, নিজের কাজে ততটা উৎসাহী নন। আর পুলিশের সাধারণ কর্মী আজ নন-গেজেটেড সমিতির আশ্রয় থেকে নিজের অফিসারদের অমান্য না হোক, তাচ্ছিল্য করতে শিখেছে। নিজের পিঠ বাঁচাতেও খুব ভাল শিখেছে, যেটা দেখা গেছে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারের উগ্রপন্থী হামলায়, যেখানে**

পুলিশ একটি গুলিও চালাতে পারেনি, শুধু পিঠ বাঁচিয়েছে। দিল্লির সংসদ ভবন ও গাঁধীনগরের স্বামীনারায়ণ মন্দিরের উগ্রপন্থী হামলায় পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা পুলিশের তুলনা করলে এটা আরও স্পষ্ট হবে। এখন উগ্রপন্থীরা খুনের অধিকার পেয়ে গেছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ রাজনীতিকরণের ফলে নিজেদের পেশাদারিত্ব, এবং উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এদিকে রাজনীতিকরণ না করেও উপায় নেই। কারণ তা না হলে পার্টির শাসন টিকিয়ে রাখা মুশকিল। অন্যরকম ভাষায় বলা যায়, সি পি আই (এম) এবার নিজেই নিজের প্যাঁচে পড়েছে। তাই সি পি আই (এম) ক্যাডার থেকে আরম্ভ করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত জনযুদ্ধ ও কামতাপুরীদের ভয়ে শঙ্কিত। পাশাপাশি সেই চিরাচরিত রীতিতে কেন্দ্রকে দোষ দেওয়া। অথচ 'রাজনৈতিক খুন খুন নয়'—সি পি এম-এর এই অঘোষিত তত্ত্বই (এবং এই মারাত্মক তত্ত্বের প্রতি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর নীরব সমর্থন) জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর পায়ের তলায় মাটি এনে দিয়েছে। খুনের রাজনীতিতে যারা বিশ্বাস করে তারা এটা জেনে গেছে, পশ্চিমবঙ্গে 'খুনি বিপ্লবী'দের বিচার হয় না। গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ তাদের বিচার চাইলেই ব্যাপারটা হয়ে যাবে অগণতান্ত্রিক। অতএব রাজনৈতিক খুন এখানে আর খুন নয়। অন্তত রাজনৈতিক দলগুলো এই 'সত্য' প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

আমাদের দেশের গণতন্ত্রের বহু দোষ আছে, কিন্তু এর চেয়ে ভাল শাসনব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। 'গাইডেড্ ডিমোক্রেসি, 'পিপলসো ডিমোক্রেসি', 'বেসিক ডিমোক্রেসি' 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র' সবার উপরে পার্টি সত্য'-তন্ত্র ইত্যাদি যা কিছু তা নানারকম মোড়কে একনায়কতন্ত্র বা এক-পার্টি তন্ত্র, বা গণতন্ত্রের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়। যদি আমরা আমাদের সংবিধানকে রক্ষা করতে চাই তাহলে এই সব বিকৃতি বা অনুপ্রবেশ রোধ করতেই হবে। যদি আমরা আমাদের গণতন্ত্রকে, উদার বা বহুদলীয় গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই তাহলে মনে রাখতে হবে, এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে রুল অফ ল-- অর্থাৎ আইনের ওপর কেউ নয়, কোনও পার্টি নয়, কোনও কাকাবাবু-মামাবাবু, বাবুবিবি, দিদি-দাদা নয়, কোনও তত্ত্ব নয়, কোনও মানুষ নয়! এই আইনের চোখে সবাই সমান। এটাই আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত সর্বাপেক্ষা সভ্য শাসনতন্ত্র এবং সভ্য আইন। এবং সে আইনে রাজনৈতিক খুন, অর্থনৈতিক খুন, সাম্প্রদায়িক খুন, বিপ্লবী খুন, শ্রেণীখুন, গুমখুন ইত্যাদি যে-কোনওরকম খুন, শ্রেণীখুন, গুমখুন ইত্যাদি যে-কোনওরকম খুন চরম আইনবিরুদ্ধ কাজ। করলে (এবং ধরা পড়লে) বিচার হবে এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে।

. সৌজন্যে – সাপ্তাহিক 'দেশ'

ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা কারা ?

আমরা একটি জাতীয়তাবাদী, জনবাদী, হিন্দুত্ববাদী, গণতান্ত্রিক, মেকি-সেকুলারবাদ বিরোধী,মার্কসবাদ-বিরোধী, সংখ্যালঘু তোষণ বিরোধী পার্টি। এ শব্দগুলির মানে কি ?

তথাগত রায় –

* জাতীয়তাবাদী মানে আমরা দেশকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করি, আমরা দেশের সঙ্গে অন্য কোন দেশকে একাসনে বসাবার কথা স্বপ্নেও ভাবি না।

* জনবাদী মানে আমাদের প্রেরণা ভারতের জনসাধারণের কাছ থেকে, আমাদের লক্ষ্য ভারতের জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ, আমাদের সদস্যরা ভারতের জনসাধারণ থেকেই এসেছেন। আমাদের নেতারাও উঠে এসেছেন জনসাধারণের থেকেই, আমাদের নেতা হবার জন্য কোন পরিবারের মানুষ হওয়া বা কোন ধর্ম বা জাতিগোষ্ঠীর হওয়ার প্রয়োজন নেই।

* হিন্দুত্ববাদী, মেকি -সেকুলারবাদ বিরোধী, সংখ্যালঘু-তোষণ বিরোধী - - এই শব্দগুলি নিয়েই আমাদের রাজনৈতিক শত্রুদের সবচেয়ে বেশি রাগ। আমরা কেন হিন্দুত্ববাদী? কারণ এই দেশের সব মানুষই এখন হিন্দু আছে বা আগে পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিলেন। যে ভারতীয়ত্ব নিয়ে আমরা গর্বিত তার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে আজকের হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের অতীতের হিন্দু পরম্পরা। যে রাম, যে অর্জুন, সে সমুদ্রগুপ্ত নিয়ে হিন্দু হিসেবে আমি গর্বিত তা নিয়ে

একজন মুসলমানও গর্বিত। কারণ ওঁদের সঙ্গে আমার যতটা সম্পর্ক ওঁদেরও ততটাই। আর মেকি সেকুলারবাদ ও সংখ্যালঘু-তোষণ নামে যে চরম রাজনৈতিক ভন্ডামির চাষ গত পঞ্চান্ন বছর ধরে কংগ্রেস ও বাম দলগুলি করে চলেছে সে ভন্ডামির মুখোশ আমরা খুলে দিয়েছি বলেই কি এত রাগ?

* কি এই ভন্ডামি? ভন্ডামি মানে দ্বিচারিতা, ভন্ডামি মানে দুরকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একরকম জিনিসকে দেখা। না হলে বিবেচনা করুন : যে সব 'সেকুলার' -রা গুজরাটের ঘটনাকে বহুগুণ ফাঁপিয়ে তা নিয়ে অহরহ লাফাচ্ছেন তাঁরা কিন্তু বাংলাদেশে তথা পূর্ব-পাকিস্থানে গত পঞ্চান্ন বছর ধরে হিন্দু খুন, হিন্দু বিতাড়ন ও হিন্দু নারী ধর্ষণ সম্বন্ধে বোবা-কালা। জিজ্ঞাসা করলে ন্যাকা সাজেন— 'তাই বুঝি! আমরা কিছু জানি না তো'! কেউ আবার যুক্তি দেন 'ওটা তো বিদেশের ঘটনা'। কত বড় নির্লজ্জ হলে মানুষ এমন কথা বলতে পারে, যেখানে বাংলাদেশের ভোলা, আগৈলছড়া, উল্লাপাড়া, মীরেরসরাই-য়ে ধর্ষিতা, অত্যাচারিতরা আমাদের মতই সাহা-মন্ডল-দাস-ঘোষ-ব্যানার্জী-লাহিড়ি-রা! আর বিদেশই যদি যুক্তি হয় তাহলে শয়তান তালিবানের ঘাড়ে যখন মার্কিনীরা বোমা ফেলেছিল তখন ভন্ড কমরেডরা মহামিছিল বার করেছিলেন কেন?

* এর উত্তর খুব সরল। মেকি সেকুলার হলে লজ্জা থাকতে নেই, কমিউনিষ্ট হলে লজ্জা থাকতে নেই, কংগ্রেসী হলে লজ্জা থাকতে নেই। কিন্তু আমরা বিজেপি, তাই আমাদের লজ্জা আছে। আমরা তাই দ্বিচারিতা করতে পারি না। সেজন্য আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার।

* পরিশেষে আমরা মার্কসবাদ-বিরোধী। কারণ এটি একটি পুরনো পচা বাতিল মতবাদ, যাকে সারা পৃথিবী (সর্বশেষে চীন) ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু বাঙালি কমরেডরা দেড়শো বছর বয়সের মড়া আঁকড়ে বসে আছে। আর সেই মড়ার দেহ থেকে বিচ্ছুরিত রোগজীবাণুতে বাঙালি আজ অর্ধমৃত!

আমরা কারা! আমরা বিজেপি, কারণ এসব আমরা সহ্য করতে পারি না।

ইসলামী জেহাদের উদ্যত ফণা থেঁতলে গুঁড়িয়ে দিয়েছে চীন

এদিকে চীনা প্রভুর দাসানুদাস এদেশের কমিউনিস্টরা ইসলামীদের পা চাটছে

।। দূর্গাপদ ঘোষ ।।

ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য যাদের দিনরাত চোখে ঘুম নেই তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে কমিউনিস্টরা। ইদানীং তাদের মুসলিম মদতের অন্যতম কর্মসূচী হয়ে দাঁড়িয়েছে গুজরাটের গোধরা কান্ডের নায়করা মুসলিম দুষ্কৃতী নয়, অত্যন্ত সুকৌশলে এমন প্রচার চালানো। এহেন আত্মপ্রবঞ্চক ভারতীয় কমিউনিস্টদের আদর্শভূমি এখন চীন দেশ। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ওই রাশিয়ার প্রতি এখানকার কমিউনিস্টদের একাংশের যেটুকু আনুগত্য ছিল তাও এখন উবে গেছে। দল পাকাপাকি করলেও সোভিয়েতপন্থী যারা ছিল তারাও মনে মনে কার্যত এখন তাদের বাকি শরিকদের মতো চীন অনুগত। একই সঙ্গে ভারতে মুসলিম মদতের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা অন্যান্যদেরও আগের চাইতে আরও বেশি করে উৎসাহিত করার চেষ্টায় নেমেছে, ভারতের প্রায় সর্বত্রই ইসলামী সন্ত্রাসবাদের ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা চলতে থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু প্রশ্ন হল, এখানকার কমিউনিস্টরা কিংবা তাদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে জোট বাঁধতে এগিয়ে আসা তথাকথিত সেকুলারবাদীরা কি জানেন? পাশের বাড়ি চীন দেশের কমিউনিস্ট সরকার তাদের দেশে ইসলামীদের কেবল জঙ্গীয়ানাই নয়, তাদের বাড়বাড়ন্তের উদ্যত ফণা থেঁতলে মাটিতে মিশিয়ে দিতে কি ধরনের কড়া এবং কৌশলী ব্যবস্থা নিয়েছেন। এখানকার সি পি এমের তাবড় নেতা অনিল বিশ্বাস সম্প্রতি চীনে গিয়ে জেনে এসেছেন সেখানে দুনীতির দায়ে কেন্দ্রীয় স্তরের নেতাদেরও ফাঁসি হয়, কাজে ফাঁকি দিলে ছাঁটাই হতে হয় শ্রমিকদের। ভাল কথা। কিন্তু ইসলামী জঙ্গীপনা চালালে কি হয় সেকথা কি জেনে আসেন নি? নাকি জেনেশুনেও স্রেফ চেপে যাচ্ছেন?

ঘটনা হল, দেঙ শাও পিঙ-এর সময়ে চীন থেকে বেশ বড় সংখ্যায় মুসলিমরা হজ করতে যেত। সেই সুযোগে সৌদি আরবের উগ্র মৌলবাদীরা অন্যান্য দেশের মুসলিমদের মতো চীনা মুসলিমদেরও জেহাদের উস্কানি দেয়। ফলস্বরূপ চীনের সিঙকিয়াঙ প্রদেশে বিষাক্ত ফণা তুলতে থাকে সেখানকার মুসলিমরা। জেহাদ-এর খোলসে সেখানেও শুরু হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট সরকার তার মাথা থেঁতলে দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা নিতে বাকি রাখে নি। কালবিলম্ব না করে ২০০-রও বেশি উগ্রবাদীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। জেলে ভরে দেয় হাজার উইগার মুসলিমকে।

চীনা বিপ্লবের পর ১৯৪৯ সালে সিঙকিয়াঙ চীনের দখলে আসে। সে সময় সেখানে উইগার মুসলমান জনসংখ্যার হার ছিল ৯০ শতাংশ। চীনের এই বৃহত্তম প্রদেশটি পাকিস্তান, আফগানিস্তান, কাজাকিস্তান দিয়ে ঘেরা। সুতরাং সেখানেও যে ইসলামী উগ্রপন্থায় কুলোর বাতাস লাগবে সেকথা বলার অপেক্ষা করে না। এবং ঘটনা হল,

চীনা দাওয়াই

চীনের মতো ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল বলে কথিত রাষ্ট্র ইসলামী জেহাদীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নিয়েছে তা এইরকম। সি পি এম নেতা অনিল বিশ্বাস সম্প্রতি চীনে গিয়ে এসব দেখে এলেও এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি —সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

১) ৫০ বছরের কম বয়সী উইগার মুসলিমদের হজে যাওয়া নিষিদ্ধ।

২) ১৮ বছরের কম বয়সীদের মসজিদে যাওয়া এমনকি অন্যত্র নমাজ পড়া নিষিদ্ধ।

৩) নমাজের জন্য মসজিদ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেওয়া নিষিদ্ধ।

৪) নমাজের পর রাজনৈতিক কিংবা গরম গরম বক্তৃতাও বেআইনী।

৫) সিঙকিয়াঙের সমস্ত মাদ্রাসার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৬) ইসলামী সাহিত্যের প্রকাশনাও নিষিদ্ধ।

৭) উইগার মুসলিমদের ভাষা আর আরবী লিপিতে লেখা যাবে না — লিখতে হবে চীনা লিপিতে।

৮) চীনা মুসলিমদের চীনা নামই রাখতে হবে, সেখানে কোন আবদুল্লা-রহমতুল্লা চলবে না।

বিগত ১০ বছরে তাদের হাতে অন্তত ১৬০ জনের মৃত্যু ঘটেছে। প্রায় ৬০০ উইগার এমনকি আল-কায়েদার ঘাঁটিতে গিয়ে প্রশিক্ষণও নিয়েছে। কিন্তু চীনা সরকার সিঙকিয়াঙকে 'কাশ্মীর' হতে দেয় নি। কিছু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা ছাড়াও নিয়েছে সুদূর প্রসারী ব্যবস্থা।

দূরগামী ব্যবস্থার মধ্যে একটি হল, অতি কৌশলে হান্ সম্প্রদায়ের চীনাদের সিঙকিয়াঙ-এ নিয়ে গিয়ে বসানো। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে এখন সেখানকার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এসে গেছে উইগার মুসলামানদের সংখ্যা। চীনে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর এক সন্তান আইন প্রণীত ও কার্যকর করা হয়েছে। কিন্তু সারা চীনে এই আইন চালু করা হলেও তাতে ছুট দেওয়া আছে সিঙকিয়াঙ প্রদেশে বসবাসকারী হান্দের ক্ষেত্রে। উপরন্তু সরকারি তরফেই হান্দের উৎসাহিত করা হচ্ছে উইগার মুসলিম মেয়েদের বিবাহ করতে। অনুমান, এইভাবে চলতে থাকলে আগামী ১০ বছর পরে এখানে হান্দের সংখ্যা হয়ে যাবে ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ। অন্যদিকে মাত্র ২০ বছরের মধ্যে সেখানে মুসলিমদের সংখ্যা অকল্পনীয় ভাবে কমে যাবে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশে।

আর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানলেও একেবারে তাজ্জব বনে যেতে পারেন এখানকার মুসলিম তোষণকারীরা। জয়পুর থেকে প্রকাশিত **'পাথেয় কণ'** -এর গত জুলাই সংখ্যায় এসব নিয়ে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাদের বুকে একেবারে শক্তিশেল বিঁধতে পারে। যদিও তাদের বলার কিছু নেই। করার তো নেই-ই।

*২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে ইসলামী জঙ্গীহানার পর থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ৪০০ মুসলিম কট্টরপন্থীকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে চীন সরকার। তার মধ্যে দেশদ্রোহীতার অভিযোগে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে ২০ জনকে।

*৫০ বছরের কম বয়সী উইগার মুসলিমদের জন্য হজে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে জেহাদের উস্কানি পেয়ে এলেও তা করার তেমন শারীরিক ক্ষমতা না থাকে।

*১৮ বছরের কম বয়সীদের মসজিদে যাওয়া, এমনকি অন্যত্রও নমাজ পড়া নিষিদ্ধ। যাতে মসজিদের ইমামরা এই সুযোগে কচি মগজ সহজে ধোলাই করতে না পারে। আসলে মগজ ধোলাইয়ের ব্যাপারটা কমিউনিস্টরা সবচাইতে ভাল বোঝে তো!

*নমাজের জন্য মসজিদ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত দূরঅস্ত এক ওয়াক্তও আজান দেওয়া বন্ধ। নমাজের পরে মসজিদ থেকে রাজনৈতিক কিংবা গরম গরম ভাষণ দেওয়া নিষিদ্ধ।

*সিংকিয়াঙ-এ সমস্ত মাদ্রাসার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে ইসলামী সাহিত্যের প্রকাশনা।

*এই প্রদেশের ৮ হাজার মৌলবীর প্রতি চীনা সরকার নির্দেশ জারি করেছে যে, তাদের সরকারি প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে যাওয়া বাধ্যতামূলক। সেখানে নিয়মিত চীনা আইন এবং পরম্পরা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

*উইগার ভাষাও আর আরবী লিপিতে লেখা যাবে না, লিখতে হবে চীনা লিপিতে। যাতে চীনে থেকেও আরবের খেজুরতলায় আনুগত্য পড়ে না থাকে।

চীনা মুসলিমদের চীনা নামই রাখতে হবে। সেখানে কোন আবদুল্লা চলবে না। সেখানকার মসজিদও চীনা শিল্পরীতির বা প্যাগোডা ধাঁচের। সিঙকিয়াঙেও তাই। উপরন্তু চীনা সরকার *চীনা ভাষা শেখা মুসলিমদের বিশেষ* পুরস্কার দেওয়া শুরু করেছে।

*সিঙকিয়াঙ-এ কোন পর্যটক কিংবা সাংবাদিক গেলে চীনা পুলিশ তাদের দিকে কড়া নজর রাখে। কোথাও কোন উইগার মুসলিমকে তাঁদের কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখলেই পুলিশ তঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে।

অথচ ভারতে মার্কামারা ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে 'পোটা' প্রয়োগ করলেও এখানকার তথাকথিত প্রগতিবাদী সেকুলাররা দল পাকিয়ে হৈ চৈ বাধিয়ে থাকে। এমনকি জনপ্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক মন্দির স্বরূপ সংসদ ভবনে পর্যন্ত অচলাবস্থা সৃষ্টি করতেও লজ্জাবোধ করে না। সম্প্রতি করাচিতে থাকা দাউদ চেলা ছোট শাকিল-এর সঙ্গে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের নামী তারকা সঞ্জয় দত্ত সহ বেশ কয়েকজনের সেল ফোনে অনেক আপত্তিজনক কথাবার্তা ধরা পড়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে। এরকম অনেক ব্যাপার অহরহ ঘটছে। মসজিদের ইমাম *পর্যন্ত* পাকিস্তানী গুপ্তচর বাহিনীর *চর হিসেবে ধরা পড়ছে। এদের বিরুদ্ধে পোটা প্রয়োগ করলে যদি কেউ তার বিরোধিতা* করতে আসে তবে তাদেরও কি উগ্রপন্থীদের দোসর তথা দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা কি উচিত নয়? অন্তত এখানকার চীনপন্থীরা কি বলেন?

সৌজন্যে জয়পুর থেকে প্রকাশিত 'পাথেয় কণ' এর গত জুলাই ২০০২।

বামফ্রন্ট ও সি পি এম - কিছু জঙ্গী এবং মৌলবাদী মুসলমানের ভয়ে গর্তে ঢুকে রাজ্যের সাধারণ মুসলিম সমাজের বিপদ ডেকে আনছে

রাজ্য-রাজনীতি ঃ বরুণ সেনগুপ্ত

মৌলবাদী মুসলমানদের হুঙ্কারের কাছে সি পি এম, বামফ্রন্ট ও রাজ্য সরকার যেভাবে আত্মসমর্পণ করল তা শুধু ন্যক্কারজনক নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও গোটা দেশের পক্ষে মারাত্মক। তাঁরা শুধু ভোটের কথা ভাবলেন। মৌলবাদী মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে প্রচারে নামল। তাঁরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয় পেলেন এবং গর্তে ঢুকলেন। কিন্তু, একবারও ভেবে দেখলেন না যে, এর ফলে মৌলবাদী মুসলমানদের সাহস কত বেড়ে গেল এবং পশ্চিমবঙ্গে জাল বিস্তারে আই এস আই চরদের কত সুবিধা হয়ে গেল।

এটা শুধু যে কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযোগ তা নয়, বামফ্রন্ট সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরও গত ১০-১৫ বছর ধরে রাজ্যের মৌলবাদী মুসলমানদের সম্পর্কে রাইটার্স বিল্ডিংসকে সতর্ক করে যাচ্ছে। তারা বহু উদাহরণ দিয়েছে। কিছু মৌলবাদী মুসলমানের সাহায্যে কীভাবে কিছু মসজিদ ও মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে আই এস আইয়ের চররা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘাঁটি গড়ে তুলছে, এ কথা জেনেও এবং এ সম্পর্কে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য পেয়েও বামফ্রন্ট সরকার বহু বছর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

সম্প্রতি খাদিমকর্তা অপহরণের ঘটনার পর নতুন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মৌলবাদী মুসলমানদের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেন। বুদ্ধদেববাবু তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমি রাজ্য সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল অফিসারের কাছে শুনেছি, কিছু মৌলবাদী মুসলমানের সহযোগিতায় আই এস আইয়ের চররা রাজ্যে কত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা জানতে পেরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শিউরে উঠেছিলেন। তারপর তিনি পার্টির রাজ্য নেতৃত্বকে সব কিছু জানিয়ে এব্যাপারে এগোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন, এদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতেই হবে। আমি আরও জানি, পার্টি কখনওই এই ব্যাপারে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে এগোতে বারণ করেনি। বরং, পার্টির সর্বোচ্চ রাজ্য নেতৃত্ব মনে করেছিলেন, অবিলম্বে কিছু মৌলবাদী

মুসলমানের সঙ্গে আই এস আইয়ের চরদের যোগাযোগের মূলে আঘাত হানতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গকে হঠাৎ খুব বড় বিপদে পড়তে হতে পারে।

এখন অবশ্য রাজ্য সি পি এমের কিছু কিছু নেতা অন্য কথা বলছেন। কিন্তু, এতে আমার অন্তত কোনও সন্দেহ নেই যে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আই এস আই মদতপুষ্ট মৌলবাদী মুসলমানদের ঘাঁটিগুলিকে ভাঙার জন্য যেভাবে এগোচ্ছিলেন তার পিছনে পার্টির রাজ্য নেতৃত্বের অধিকাংশেরই পূর্ণ সমর্থন ছিল। কিন্তু, কিছু দিনের মধ্যেই তাঁরা যখন দেখলেন, মৌলবাদী মুসলমানরা রে রে করে রাস্তায় নেমে পড়েছে অমনি সবাই ভয়ে গর্তে ঢুকলেন। বলা হল, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নামে যে সব কথা খবরের কাগজে বেরিয়েছে তা ঠিক নয়। তিনি মৌলবাদী বা জঙ্গী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অথবা কোনও মাদ্রাসা ও মসজির্দে আই এস আই ঘাঁটি গড়ে ওঠার ব্যাপারে কোনও কথা কখনও বলেননি।

(এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা যে আর হতে পারে না তার প্রমাণ শুধু বিভিন্ন 'বুর্জোয়া সংবাদপত্রেই' নেই, তার প্রমাণ রয়েছে রাজ্যের বহু টিভি সংস্থার ক্যাসেটে ক্যাসেটে। বুদ্ধদেববাবুর বিভিন্ন বক্তৃতা সেইসব ক্যাসেটে ধরা রয়েছে। মাদ্রাসা সম্পর্কে, মসজিদ সম্পর্কে, কিছু মাদ্রাসা ও মসজিদে পাকিস্তানি চরদের ঘাঁটি সম্পর্কে তিনি কী কী বলেছেন, এই ক্যাসেটগুলি চালালেই সকলেই তা দেখতে এবং জানতে পারবে।)

কিন্তু সি পি এম ও বামফ্রন্ট নেতারা মৌলবাদী মুসলমান নেতাদের ভয়ে এখন এতই ভীত যে তাঁরা এই প্রসঙ্গে আর কোনও আলোচনা বা বিতর্কে যেতে সাহসই পাচ্ছেন না। তাঁরা সবাই এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে ব্যস্ত।

আর, তাঁরা যে এখন শুধু শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন তাই নয়, মৌলবাদী জঙ্গী এবং আই এস আই অনুগত সামান্য কিছু মুসলমানকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানা আবোল তাবোল কথাও বলছেন।

যেমন, সম্প্রতি একজন সি পি-এম নেতা বলেছেন, "বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো জাতীয়তাবাদী-বিরোধী হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন যেমন রয়েছে, তেমনই লস্কর-ই-তোইবার মতো সংগঠনও সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে।" পার্টির আর একজন নেতা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, "শুধু আই এস আই কেন, আর এস এসও রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় অর্ন্তঘাতমূলক কাজ চালাচ্ছে।"

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা আর.এস এসকে কেউ যদি উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি বলে মনে করেন, তা করার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই তাঁর আছে। কিন্তু, আর এস এস বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে লস্কর-ই-তোইবার কি কোনও তুলনা চলে? আর এস এস বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কি কোনও বিদেশী গুপ্তচর সংস্থা পরিচালিত ভারত-বিরোধী

জঙ্গী সংগঠন? আর এস এস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কি আই এস আই বা কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর সংস্থার মদতে সৃষ্টি হয়েছে? এবং সেইসব রাষ্ট্রের নির্দেশ ও কথামতোই কি এই সংগঠনগুলি চলে এবং হামলা করে?

আর একজন সি পি এম তো মাদ্রাসাগুলির পক্ষে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "আনন্দমার্গীরা যে স্কুল করেছে তাতেই বা আমাদের কী করার আছে? আমরা কি সেগুলিকে বাধা দিতে পারি? আমরা কি সেগুলিকে বন্ধ করে দিতে পারি?" যদি আর এস এস বা আনন্দমার্গী বা অন্য কোনও ভারতীয় সংগঠন পরিচালিত কোনও স্কুল বা পাঠশালায়ও জঙ্গী ট্রেনিং দেওয়া হয় বা সেগুলি থেকে যদি অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হিংসা ছড়াবার চেষ্টা করা হয় তাহলে কি রাজ্য সরকার তাতে বাধা দেবে না আজ যদি কোনও বিদেশী গুপ্তচর সংস্থা আর এস এস বা আনন্দমার্গী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘাঁটি করে এ দেশে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ শুরু করে দেওয়ার চেষ্টা করে, বামফ্রন্ট সরকার কি তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে না?

এ দেশে প্রত্যেক ধর্মের মানুষেরই নিশ্চয় তাদের সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু, পৃথিবীর কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কি কাউকে ধর্মশিক্ষার নামে জঙ্গীপনা বা অন্য কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয়? বা, ওইসব তথাকথিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কি কাউকে জাতীয়তা-বিরোধী কার্যকলাপ চালাবার অধিকার দেওয়া যায়?

আসলে,বামফ্রন্ট এবং সি পি এম নেতারা এখন জঙ্গী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছেন যেমন, শনিবার 'গনশক্তিতে এই প্রসঙ্গে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে তার কোথাও মৌলবাদী মুসলীম সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা নেই। এখানে যে আই এস আই ব্যাপক নাশকতামূলক কাজ চালাবার জন্য দ্রুত জাল ছড়াচ্ছে সে সর্ম্পকেও 'গণশক্তির' সম্পাদকীয় সম্পূর্ণ নীরব। পরিবর্তে তারা মৌলবাদী হিন্দু সংগঠনগুলির বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলেছে। নিঃসন্দেহে ওঁরা বলতে পারেন মৌলবাদী হিন্দু সংগঠনগুলির বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু, তার মানে কি এই যে , মৌলবাদী মুসলমানদের খুশী করার জন্য আমাদের নেতারা শুধু 'মৌলবাদী হিন্দু সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কথা বলবেন, আর আই এস আই চর এবং মৌলবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলবেন না?

আসলে, আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই মুষ্টিমেয় মৌলবাদী মুসলমানের ভয়ে কখনও দেশের কোটি কোটি সাধারণ মুসলমানের স্বার্থ দেখার কথা চিন্তা করেনি। মুষ্টিমেয় মৌলবাদী মুসলমান যে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মুসলমানের সবচেয়ে বড় শত্রু সে কথা বোঝবার কোনও চেষ্টাও আজ পর্যন্ত এ দেশের বড় কোনও তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী দল করেনি। এমন কি,

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের প্রধান শাসক দল সি পি এমও আই এস আই চরদের ভয়ে কম্পমান। আই এস আই চরদের কিছু বললে রাজ্যের সাধারণ মুসলমানরা চটে যেতে পারে, এটা ধরে নিয়ে তাঁরা অনেকে এখন 'আই এস আই চর' কথাটা মুখে উচ্চরণ করতেও সাহস পাচ্ছেন না! তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই মুষ্টিমেয় মৌলবাদী মুসলমানকে খুশি রেখে সাধারণ মুসলমানদের ভোট আদায়ের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। গত ২৫-৩০ বছর ধরে গোটা দেশেই এই প্রবণতা প্রচন্ডভাবে বেড়েছে। ১৯৪৭ সনের আগে এঁরাই মুসলিম লিগকে খুশি করার জন্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগ সমর্থন করেছিলেন।

এ রাজ্যেও সি পি এম এবং বামফ্রন্ট গত ৩০-৩৫ বছর ধরে যেন তেন প্রকারে মুসলিম ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। আমি গত রবিবারের লেখায় এ ব্যাপরে কিছুটা বলেছি। **(১৯৬৬-৬৭ সনেওযে একাধিক সি পি এম নেতা মুসলীম ভোট সংগ্রহের জন্য গোপনে কলকাতার পাক দূতাবাসের সঙ্গে নানা ধরনের রফা করতেন তার বহু প্রমানপত্র এখনও দিল্লীতে 'র' এবং আইবির অফিসে জমা আছে। জাতীয় স্বার্থে এইসব কাগজ পত্র এখন প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন বলেই আমার মনে হয়।)**

সি পি এম বা যে কোনও দল নিঃসন্দেহে যে কোনও সংখ্যালঘুগোষ্ঠীর স্বার্থের কথা বলতে পারে। কিন্তু , তার মানে এই নয়, কোনও বিদেশী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বা সেইসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে গোপনে রফা করে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। শাহবানু মামলার পর রাজীব গান্ধী যেভাবে মৌলবাদী মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন, তাও অত্যন্ত নক্কারজনক। মুসলমান ভোট সংগ্রহের জন্য আজ উত্তরপ্রদেশে সি পি এমের সমর্থনপুষ্ট মহান নেতা মুলায়ম সিং যাদব যে ধরনের নির্বচনী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা শুধু বিস্ময়কর নয়, দেশের পক্ষে মারাত্মকও।

আবার বলছি, ভোটের লোভে এ দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল মৌলবাদী মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পন করছে। তাদের মাথায় তুলে নাচছে। তাদের শক্তি ও প্রভাব বাড়াবার সুযোগ করে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ যে ভাবে সি পি এম ও বামফ্রন্ট কিছু মৌলবাদী ও পাক মদতপুষ্ট জঙ্গী মুসলমানের হুঙ্কারের কাছে আত্মসমর্পন করল তাও এ রাজ্যের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক হতে বাধ্য।

আমি আরো মনে করি, এ জিনিষ গোটা রাজ্যের সাধারণ মুসলমানদের পক্ষেও বিশেষভাবে বিপজ্জনক। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। এ দেশের হিন্দুরা যদি দেখে যে কিছু জঙ্গী এবং মৌলবাদী মুসলমানদের ভয়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল কম্পমান, তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মৌলবাদী এবং জঙ্গী হিন্দু সংগঠনের শক্তি বাড়াই কি খুব স্বাভাবিক নয়?

কয়েক বছর আগে কলকাতার কয়েকজন বর্ষীয়ান মুসলমান তাঁদের ধর্মের লোকদের কিছু সমস্যা আলোচনা করতে এসেছিলেন। আমি তাঁদের বলেছিলাম, আপনারা যাঁরা সাধারণ মুসলীম নাগরিক তাঁরা যদি নিজেদের জঙ্গী এবং মৌলবাদী মুসলমানদের থেকে আলাদা না করতে পারেন, যদি আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও প্রভাব দেখাতে না পারেন, তাহলে জঙ্গী এবং মৌলবাদী মুসলমানদের ক্ষমতাই আরও বেড়ে যাবে। এবং তার প্রতিক্রিয়ায় এখানে জঙ্গী হিন্দু সংগঠনও বাড়বে। আমি তাদের আমাদের এলাকারই একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ৩০-৪০ বছর আগে মল্লিকবাজারে বিভিন্ন মসজিদে এত মাইক লাগিয়ে এতো আজান দেওয়া হত না। আমি তাঁদের জানিয়ে ছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে আমি আজানের বিরুদ্ধ নই। বরাবরই আমার খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গে। আজান শুনতে আমার কখনও খারাপ লাগে না। পূর্ব বাংলায় থাকতে নিয়মিত আজান শুনতাম। কিন্তু, আপনারা মনে রাখবেন, মল্লিক বাজারে মাইকে আজান যত বাড়বে ততই হনুমানজি এবং মা কালীর মন্দিরের সংখ্যাও বাড়বে। আজ মল্লিক বাজারে ঠিক তাই ঘটেছে। ওই এলাকায় এখন যত মুসলমান ধর্মস্থান, হিন্দুধর্মস্থানের সংখ্যা তার চেয়ে কম নয়। এবং, সবচেয়ে যেটা লক্ষ্যনীয় তা হল, ওই হিন্দু ধর্মস্থানগুলিতে কিছু লোকের মধ্যে 'জঙ্গী এবং লড়াকু' মনোভাব দিন দিনই বাড়ছে। আমার আশঙ্কা , এ রাজ্যে মাদ্রাসা এবং মসজিদ যত বাড়বে মা কালী এবং হনুমানজীর মন্দিরও তত বাড়বে। মুম্বইতে একটা সময়ে রাস্তা আটকে প্রতি শুক্রবার নামাজ পড়ার রীতি প্রচন্ডভাবে বেড়ে গিয়েছিল। আর, তারই পাল্টা হিসাবে শিরসেনা সন্ধ্যায় বহু রাস্তা আটকে আরতী শুরু করে দিয়েছিল।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন ধর্মের লোকদের ধর্মীয় উসকানি দিয়ে এবং ধর্মীয় বিচারে খুশী রেখে যত বেশী ভোট যুদ্ধে জেতার চেষ্টা করবেন ততই জাতীয় পর্যয়ে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি জটিল এবং বিষাক্ত হয়ে উঠতে বাধ্য।

সর্বশেষে বামফ্রন্ট নেতাদের কাছে আমার আবেদনঃ মুষ্টিমেয় মৌলবাদী এবং আই এস আই মদতপুষ্ট জঙ্গী মুসলমানই এ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমানের প্রতিনিধি নয়। আপনারা সাধারণ শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের স্বার্থ দেখুন। তাদের যথাসম্ভব দেশের রাজনৈতিক মূলস্রোতে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। ভোটের লোভে তাদের 'মুসলমান' হিসাবে আলাদা করে দেখবেন না, রাখবেন না। তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে দেখুন। তাদের উপর যাতে পাক মদতপুষ্ট মৌলবাদী এবং জঙ্গী মুসলমানেরা প্রভাব বাড়াতে না পারে সে জন্য সর্বতোভবে চেষ্টা করুন।

মনে রাখবেন, আই এস আই মদতপুষ্ট মুষ্টিমেয় জঙ্গী মুসলমান যত শক্তিশালী এবং বেপরোয়া হয়ে উঠবে, ততই এ রাজ্যে মৌলবাদী হিন্দু সংগঠনগুলির শক্তি বাড়বে।

বিশ্বহিন্দু পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রচারিত। দৈনিক 'বর্তমান' এর সৌজন্যে।

প্রকাশক
শ্রী অরুণ ঘোষ
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট
কলকাতা -৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ২১শে জানুয়ারী, ২০০৩

লেজার টাইপসেটিং
"ডিজিটেক"
কলকাতা

মূল্য ঃ ৩.৫০